প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯



প্রকাশক
শ্রীশঙ্খনীল দাস
এস পি পি
ঋষি বঙ্কিমনগর বারুইপুর দক্ষিণ ২৪-পরগণা

মুদ্রক
শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
নিতাই ঘোষ

আমার অধ্যাপক
শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
পরম পূজনীয়েষু

সূচীপত্র

ভূমিকা : উনিশ শতক

উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্য অভিনবত্বে ও বৈচিত্র্যে চমকপ্রদ। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যিক গদ্যের বিকাশ ও পুষ্টি, ঐহিক বিষয়াবলম্বনে খণ্ড কবিতা, পাশ্চাত্য এপিক ও রোমান্সের আদর্শে বাংলা মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য, সীমাবদ্ধ সাফল্য সত্ত্বেও কিছু নাটক ও উপন্যাস, এমন কি আধুনিক ছোটগল্পের উন্মেষ—সব মিলিয়ে সাহিত্যে এক নতুন যুগের সৃষ্টি। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের তথাকথিত 'পুচ্ছগ্রাহিতা' এবং সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। শুধু সৃষ্টিকর্মে নয়, সাহিত্যবিচারেও স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম। অতীত কীর্তিকে অস্বীকার করে নয়, কিন্তু নতুন কীর্তিস্তম্ভ স্থাপনের প্রয়াস। এর মধ্যে অন্য ধরনের সীমাবদ্ধতা এবং অত্যুচ্ছ্বাসের বিপদ ছিল না তা নয়, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনেরেই তখন মনে হয়েছিল, "ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল। সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—।" (মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০)। একদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ, অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের সহায়তা—সংঘাত-সমন্বয়ের চেষ্টা—আর তার ফলে জাতীয় জীবনে নবজাগরণ সম্ভব, এমন বিশ্বাস উনিশ শতকে বাঙালির মনে দেখা দিয়েছে।

জাতীয় উন্নতি বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অবশ্য আজ যেমন তেমনি সে কালেও নানা মুনির নানা মত ছিল। ১৮২২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের মনে হয়েছিল, "At present the whole empire (with the exception of a few provinces) has been placed under the British power, and some advantages have already been derived from the prudent management of its rulers, from whose general character a hope of future quiet and happiness is justly entertained." (Brief remarks regarding modern enchroach-

ments on the ancient rights of females)। ইংরেজ শাসনকে বাঙালি জাতীয় উন্নতির সহায়ক বিবেচনা করেছে। কারণ ব্যবসাবাণিজ্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যারা সে সময় প্রভূত অর্থোপার্জনে সক্ষম হয়, তাদের কাছে তথাকথিত আইনশৃঙ্খলা ও শান্তিসুখ একান্ত কাম্য ছিল। আর যাঁরা ভবিষ্যৎ জাতীয় উন্নতির কথা ভেবেছেন, তাঁরাও রামমোহনের ভাষায়, "Many of those,···such as have sufficient intelligence to foresee the probability of future improvement which presents itself under the British rulers, are not only reconciled to it, but really view it as a blessing to the country." (Additional queries respecting the condition of India, 1831)। তবে মনে হয় রামমোহন নিজে ইংরেজ শাসনের ভবিষ্যৎ সুফল সম্বন্ধে কিছুটা সন্দিহান ছিলেন। শাসনের সঙ্গে শোষণের সম্পর্ক তাঁর জানা ছিল। সরকারি আইনকানুনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রজার দুরবস্থা দূরীকরণে তা কতটা সক্ষম? প্রায় চল্লিশ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই একই প্রশ্ন তুলেছেন, যদিও 'ইংরাজরাজ্যের' আশু অবসান তিনি তখনও কাম্য বা অনিবার্য বিবেচনা করেন নি, "ব্রিটিশ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতি বারে দুর্ব্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইনকারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন।···আইন আছে—সে আইনে অপরাধী জমীদার দণ্ডনীয় হয় না কেন? আদালত আছে—সে আদালতে দোষী জমীদার চিরজয়ী কেন? ইহার কি কোন উপায় হয় না? ···শাসনদক্ষ ইংরাজেরা কি ইহার কিছু সুবিধি করিতে পারেন না? যদি না পারেন, তবে কেন শাসনদক্ষতার গর্ব্ব করেন? যদি পারেন, তবে মুখ্য কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা করেন কেন? আমরা এই দীন হীন ছয় কোটি বাঙ্গালি কৃষকের জন্য তাঁহাদের নিকট যুক্তকরে রোদন করিতেছি—তাঁহাদের মঙ্গল হউক!—ইংরাজরাজ্য অক্ষয় হউক!—তাঁহারা নিরুপায় কৃষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।" (বঙ্গদেশের

কৃষক, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৭৯)। ছয়কোটি বাঙালি কৃষকের উন্নতি বা মঙ্গলসাধনে 'ইংরাজবাহাদুর' সচেষ্ট হয় নি, ফলে ইংরেজশাসনে প্রজাবৃদ্ধি বাণিজ্যবৃদ্ধি এমন কি দেশের ধনবৃদ্ধি হলেও দেশের নয়শত নিরানব্বই জনের শ্রীবৃদ্ধি হয় নি।

ইংরেজশাসন এবং জাতীয়জীবনে নবজাগরণ সম্বন্ধে একদিকে বিশ্বাস-মুগ্ধতা, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের দুরবস্থা এবং জনজীবন থেকে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের বিচ্ছিন্নতার বোধ উনিশ শতকে বাঙালির মধ্যে একই সঙ্গে দেখা যায়। এর ফলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর চিন্তাভাবনায় দ্বিধাদ্বন্দ্ব অথবা শুধু ব্যক্তির স্ববিরোধটুকুই আমরা দেখি। যুগের প্রবণতাকে বোঝার চেষ্টা করি না। তাই বিশ শতকের শেষ পাদে যখন উনিশ শতকের বিচারে প্রবৃত্ত হই তখন নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতাই আমাদের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে। মনে হয় এতদিন, বিশেষত বিশ শতকের প্রথমার্ধে গত শতাব্দী নিয়ে যেন একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছে। যদুনাথ সরকার থেকে সুশোভন সরকার পর্যন্ত ঐতিহাসিকেরা যে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কথা বলেন, তার বিরোধিতা করে একালে পণ্ডিতেরা অনেক পুথি রচনা করেন, শুরু হয় পুনর্বিবেচনার নামে অপবাদ-নিন্দাবাদের পালা।

উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমার্থক মনে করার কারণ নেই। এমন কি মধ্যযুগ সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন প্রয়োজন। ইউরোপে মধ্যযুগ এবং রেনেসাঁস সম্বন্ধে একদা যে সব কথা বলা হতো, এখন তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সুশোভন সরকার, যিনি দাবি করেছেন 'বেঙ্গল রেনেসাঁস' অভিধা তাঁরই দেওয়া, পরবর্তীকালে তিনি বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সীমাবদ্ধতার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন (দ্র. Supplementary notes : 'On the Notes on the Bengal Renaissance', Conflict within the Bengal Renaissance, *On the Bengal Renaissance*, 1979). ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সর্বাত্মক জাগরণ সম্ভব ছিল না। যেটুকু জাগরণ ঘটেছিল

তাও ইংরেজিশিক্ষার সুযোগপ্রাপ্ত হিন্দু 'ভদ্রলোকদের' মধ্যে, ফলে সাধারণ মানুষ এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের সঙ্গে বিচ্ছেদ এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছে—সব কথাই স্বীকার্য। তবু পরিবর্তন—আর সে পরিবর্তনকে সম্ভবত এক কথায় প্রগতি-পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

আজ থেকে একশো বছর আগে রমেশচন্দ্র দত্তের মতো অনেকেরই মনে হয়েছে, "The British Conquest of Bengal was not merely a political revolution, but brought in a greater revolution in thought and ideas, in religion and social progress. The Hindu intellect came in contact with all that is noblest and most healthy in European history and literature, and profited by it. The Hindu mind was to some extent trained under the influence of European thoughts and ideas, and benefited by it."* (*The Literature of Bengal*, 1895)। চিন্তা ও ভাবজগতে যে বিপ্লবের কথা এখানে বলা হয়েছে, তাকেই সাধারণত নবজাগরণ বলা হয়। আমাদের মনে পড়বে, মার্ক্স্ ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৫৩ সালে লেখেন, "একথা সত্য যে, ইংলণ্ড হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে প্ররোচিত হয়েছিল শুধু হীনতম স্বার্থবুদ্ধি থেকে, এবং সে স্বার্থসাধনে তার আচরণ ছিল নির্বোধের মতো। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো এশিয়ার সামাজিক অবস্থায় মৌলিক একটা বিপ্লব ছাড়া মনুষ্যজাতি কি তার ভবিতব্য সাধন করতে পারে? যদি না পারে, তাহলে ইংলণ্ডের যত অপরাধই থাক সে বিপ্লব সংঘটনে ইংলণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র।" (কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে, মস্কো, বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়)। রামমোহন ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফকে ইউরোপীয় 'রিফরমেশন'

* রমেশচন্দ্রের বইয়ের প্রথম সংস্করণের (১৮৭৭) ভাষা স্বতন্ত্র হলেও বক্তব্য একই।

আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গীয় সংস্কার আন্দোলনের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। অন্যদিকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহনের সমাজ ও ধর্মসংস্কার এবং ইয়ংবেঙ্গলের প্রতীচ্য ভাবদীক্ষার সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার এবং পরবর্তী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান—যেন স্বতন্ত্র দুই যুগের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। হয়তো ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সঙ্গে এই যুগবিভাগের কিছুটা যোগ আছে।

অনেক সময় আলোচনার সুবিধার জন্য উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতীচ্যবাদী ও প্রাচ্যবাদী এই দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। হয়তো রামমোহনকে প্রথম ধারার আর রাধাকান্তকে দ্বিতীয় ধারার প্রতিভূ বলা যায়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় তথা প্রাচ্য ভাবধারার প্রতি রামমোহনের সশ্রদ্ধ মনোভাবের কথা আমরা জানি। ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা ও ইউরোপীয় ভাবধারার প্রতি তাঁর পক্ষপাত তিনি গোপন করেন নি, অথচ তিনিই আবার বলেন, "If by the 'Ray of Intelligence' for which the *Christian* says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude ; but with respect to ***Science***, ***Literature***, ***or Religion***, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by a reference to history it may be proved that the World was indebted to ***our ancestors*** for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations, who cannot express scientific or abstrcat ideas without borrowing the language of foreigners." (বেঙ্গল হর্করার সম্পাদককে লেখা চিঠি, ২৩ মে ১৮২৩)।

ছয়

রামমোহনের এই কথার প্রতিধ্বনি কি উনিশ শতকের শেষভাগে অনেকের মুখে শুনি নি? অন্যদিকে রাধাকান্ত শুধু ধর্মসভার অধ্যক্ষ ছিলেন না। তিনি হিন্দু কলেজের একজন ডিরেক্টর, জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন এবং স্কুল বুক সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটির সহসভাপতি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও ছিলেন। ১৮৬৩ সালে ১৪ ডিসেম্বর 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে তিনি লেখেন, "আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু আমার মনোবৃত্তিসকল অদ্যাপি যুবার ন্যায় সবল আছে। বিশেষ হিবর সাহেব এবং লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় অবধি বঙ্গদেশে যে আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি মহৎ বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সেই সমুদয় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে কতকগুলির নিমিত্ত পরমারাধ্য পরমেশ্বরকে অহরহ অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। আর কতকগুলি বিষয় এইরূপ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে [যেমন 'পানদোষ বৃদ্ধি'] যাহাতে দুঃখ না করিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না।" বিদেশ থেকে অনেক কিছু এসেছে এদেশে—প্রথম এবং প্রধান ইংরেজি ভাষা, আর তারই মাধ্যমে ইউরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান, অল্প পরে ভাষার থেকে বড়ো হয়ে ওঠে নতুন কিছু মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ বলতে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বোঝায় স্বতন্ত্র রুচি, উদারপন্থী চিন্তাচেতনা, যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি। ফলে সমাজসংস্কারের কাজে যখন শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে তখনও সেখানে আধুনিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। অধ্যাত্মবাদের পুনরভ্যুদয় নয়, যুক্তিবাদের প্রসার। প্রাচ্যপন্থী যাঁদের মনে করি যেমন ভূদেব, তাঁদের মধ্যেও পাশ্চাত্য সংস্কার কাজ করেছে। গোঁড়ামি কোথাও ছিল না তা নয়, কিন্তু রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ সকলেই কম বেশি পরিমাণে গোঁড়ামি থেকে মুক্তির কথা ভেবেছেন। একে প্রগতি বলতেও পারি, না ও বলতে পারি। কিন্তু পরিবর্তন একটা ঘটেছে, যা নিতান্ত উপরিতলের ব্যাপার নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে ফিলট্রেশন থিওরি কতটা কার্যকর হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে এমন কি

সুদূর গ্রামেও ধীরে ধীরে শহুরে মনোভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে পল্লীগ্রামের সেই পরিবর্তমান রূপটি ধরা পড়েছে।

অবশ্য শহর আর গ্রামের মধ্যে যথার্থ যোগস্থাপন উনিশ শতকেই সম্ভব হয় নি। 'ছিন্নপত্রে'র অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম আর শহর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দুই ধারার কথা বলেন। মফস্বলের গ্রাম সেই চিরকালের ভারতবর্ষ। শহরে নগরে এখনকার পরমসত্য ইউরোপ। বোঝা যায় ইউরোপ আর ভারতবর্ষ, অথবা বর্তমান আর অতীত—দুয়ের সংঘাতের মধ্য দিয়েই নতুন কিছু একটা গড়ে উঠছিল। পূর্ব পরিকল্পনা মতো প্রত্যাশিত কিছু গড়ে না ওঠাই স্বাভাবিক। হয়তো অসংগত কিম্ভূত জবরজং এক নতুন রূপ। অন্তত উনিশ শতকের শেষপাদে ইয়ংবেঙ্গলের পরিণাম এবং নব্য হিন্দুয়ানির আত্মপ্রকাশ দেখলে তাই মনে হয়। ১৮৫৩ সালে মার্কসের মনে হয়েছিল, "ইংলণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে, পুনর্গঠনের কোনো লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। পুরনো জগতের বিলুপ্তি অথচ নতুন কোনো জগতের সৃষ্টি না হওয়ায় হিন্দুদের বর্তমান দুর্দশা এক অদ্ভুত রকমের শোকাবহ অবস্থায় পরিণত হয়েছে।" লক্ষণীয় যে এখানেও ভারতীয় সমাজ বলতে হিন্দুদের কথাই বলা হয়েছে। সমাজের কাঠামো ভেঙে দেওয়া মানে, কৃষি এবং হস্তশিল্প-নির্ভর গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা যা আধাসামন্ততান্ত্রিক বিধানে প্রায় অচলাবস্থায় পরিণত হয়েছিল, তার পরিবর্তন। কিন্তু হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্পের দ্রুত অবক্ষয় ঘটলেও কৃষিব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে নি। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হয়েছে। কিন্তু তাতে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ উপকৃত হয় নি। আধাসামন্ত-তান্ত্রিক কাঠামোও রাতারাতি ভেঙে পড়ে নি। ফলে ব্রিটিশশাসন রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা সত্ত্বেও উনিশ শতকে বাংলা দেশে আধুনিক শিল্পনির্ভর নতুন সমাজ গড়ে ওঠে নি।

এই অস্থির সময়ে পায়ের তলার মাটি যখন সরতে শুরু করেছে অথচ আঁকড়ে ধরার মতো নতুন কোনো অবলম্বনের সন্ধান মেলে নি, তখন বাঙালির আত্মসংকটের

স্বরূপ সহজেই বুঝতে পারি। উনিশ শতকের পুনর্বিচারের সময় দেশকালের পটভূমিতেই সে কালের কৃতী পুরুষদের স্থাপন করতে হবে। পিছুটান সত্ত্বেও অগ্রগতি ঘটেছে। রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেব, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেন সকলেই কমবেশি পরিমাণে সহাবস্থান-নীতিতে বিশ্বাসী। ফলে তাঁদের কথায় ও কাজে অসংগতি আছে; স্ববিরোধিতা অতিক্রম করা অনেক সময় তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ১৯৩৩ সালে আর এক কালান্তরের সামনে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ গত শতাব্দীতে চিত্তদূতরূপে ইংরেজের আগমন ও যুগান্তরের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে—"যদিও আমাদের চারদিকে আজও পঞ্জিকার প্রাচীর খোলা আলোর প্রতি সন্দেহ উদ্যত করে আছে, তবু তার মধ্যে ফাঁক করে য়ুরোপের চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছে, আমাদের সামনে এনেছে জ্ঞানের বিশ্বরূপ।" আমরা কতটা নিতে পেরেছি তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে উনিশ শতক এক নতুন পদক্ষেপ, নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে সে-কাল থেকে এ-কালে আসার এক সন্ধিক্ষণ।

১

রাধাকান্ত দেব : নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকার

রাধাকান্ত দেবের (১৭৮৩-১৮৬৭) কর্মকৃতিত্বের মূল্যাবধারণ সহজ নয়। প্রচুর প্রশংসা ও নিন্দা তিনি পেয়েছেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। রাধাকান্তের জীবিতকালেই তাঁকে নিয়ে বিতর্কের সূচনা— সে সময়ের সাময়িকপত্রে তাঁর পক্ষাবলম্বন ও বিরুদ্ধতা প্রচুর দেখা গেছে। মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রয়াত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনকালে অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, প্রশংসাবাক্য উচ্চারণই সেখানে শিষ্টাচারসম্মত। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের শোকসভায় (১৪ মে ১৮৬৭) উচ্ছ্বাসপ্রকাশের আতিশয্য দেখে, বিশেষত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রশস্তি শুনে, কিশোরীচাঁদ মিত্র সেখানেই প্রতিবাদ জানান, 'Eut while I yield to no one in my appreciation of the eminent merits of the Rajah, I must deprecate such indiscriminate laudation as Baboo Rajendra Lall Mittra has thought fit to lavish on him, because it does more harm than good, and will be abominated by the spirit of Radhakant himself. Baboo Rajendra Lall Mittra has been pleased to speak of the Rajah as if he was the flower and perfection of humanity, and of his superstition as if it were something which, far from being a bar to progress, was an aid to it. He has also given us to understand that Rajah always exercised a progressive and never a retrogressive influence on society. I should belie my convictions if I were to pass such statements uncontradicted. I am convinced that the Rajah

did not exercise a progressive influence when he agitated for the repeal of Lord William Bentinck's Law for the abolition of *Suttee*, or when he patronised the *Dhurma Shobba*, or when he petitioned against the enactment of the Lex Loci, or when he counter-petitioned against the Association of Friends for the Promotion of Social Improvement in respect to the suppression of the evils of polygamy.'[১] রাধাকান্ত দেবের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী পালনকালেও দেখা যাচ্ছে সৌজন্যবশত তাঁর জীবন ও কর্মের একাংশকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করার প্রবণতা। কিন্তু রাধাকান্ত দেবের জটিল ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারার পরিচয় গ্রহণ করতে হলে ডেভিড কফ্-এর মতো অনৈতিহাসিক ও চমকপ্রদ মন্তব্য[২] করার প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে, বরং রাধাকান্তের প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম মেনে নিয়ে তার ঐতিহাসিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় লেখা হয়েছে, '২৭ জুলাই ইণ্ডিএ গেজেট-নামক সমাচারপত্রেতে এই এক অশুভ সমাচার প্রচার হইয়াছে যে গবর্নবৃমেণ্ট এইক্ষণে সহমরণ নিবারণের চেষ্টাতে আছেন এবং এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি সকল নগরবাসির প্রতিনিধি হইয়া ঐ অনুচিত বিষয়ের প্রমাণ ও প্রয়োগ লিখিয়া সমর্পণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি মহামহিম শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন… ৷'[৩] 'এতদ্দেশীয় খ্যাত এক ব্যক্তি'র নাম করা না হলেও, তিনি যে রাধাকান্ত দেব, তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি বেণ্টিঙ্কের উত্তর পাওয়ার জন্য যাঁরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম রাধাকান্ত। ২৩ জানুয়ারি তারিখের সংবাদে বলা হয়েছে, ১৭ জানুয়ারির সভায় 'শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন সতীর বিষয়ে যে আরজী শ্রীশ্রীযুত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে

দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর পাওয়া গিয়াছে তাহা আপনারা শ্রবণ করুন সকলের অনুমত্যানুসারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব পাঠ করিলেন তাহার স্থূল তাৎপর্য্য সতীনিবারণের যে আইন হইয়াছে তাহা রহিত করিবেন না।'[৪] তারপর ফেব্রুয়ারি মাসে সতীদাহ-আইনের প্রতিবাদার্থে 'ধর্মসভা'র প্রতিষ্ঠা—সেখানে অন্যতম 'অধ্যক্ষ' হলেন রাধাকান্ত। ধর্মসভার পক্ষ থেকে সতীদাহের সমর্থনে বিলাতে যে 'আরজী' পাঠানো হয়, তার মুসাবিদা করেন রাধাকান্ত—'শ্রীভবানী-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভ্যগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান দিয়া তাহার প্রত্যেক কথার সদুত্তর করিয়াছেন ও তাঁহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া গিয়াছিল তাহার যে উত্তর তিনি দিয়াছিলেন তৎপ্রত্যুত্তর ঐ আরজীতে বিলক্ষণরূপে লিখিত হইযাছে এবং সহমরণানুমরণ ও ব্রহ্মচর্য্যবিষয় যে গ্রন্থে যত বচন আছে তাহা তাবৎ সংগ্রহপূর্ব্বক তরজমা করিয়া আরজী মধ্যে বিন্যাস করিয়াছেন এই আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি করিয়া সন্তুষ্টপূর্ব্বক বাবুকে বহুতর প্রশংসা করিয়াছেন এবং উকীল ফ্রেন্সিস বেথি সাহেব এই আরজী দেখিয়া সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেববাবুর ক্ষমতা পরিশ্রমের বাহুল্য বিবেচনা করিলেই অবশ্যই বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য হইবেন।'[৫] রাধাকান্তের অসামান্য সংস্কৃত শাস্ত্র-জ্ঞান, ইংরাজি ভাষা-জ্ঞান এবং সম্ভবত আইন-জ্ঞান—সব কিছুই ব্যয়িত হয়েছে ধর্মসভার পক্ষে এই 'আরজী' রচনার কাজে। কিন্তু রাধাকান্ত বা বেথি সাহেব কারো প্রয়াসই সফল হলো না। সতীদাহ আইন রদ করা গেল না।

সতীদাহ প্রথা রহিত হলো। ধর্মসভার প্রাথমিক প্রয়োজন শেষ হলেও ধর্মসভা বিলুপ্ত হলো না। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্করে' লেখা হয়, 'ধর্ম্মসভা পরমেশ্বর সাক্ষী করিয়া স্বকৃতি পত্রে লিখিয়াছিলেন

দেশের মঙ্গল ও ধর্ম্মরক্ষা করিবেন এবং সতিদ্বেষিদিগের সহিত পরম্পরা সম্বন্ধে ও সংস্রব রাখিবেন না কিন্তু এইক্ষণে সতিদ্বেষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ধর্ম্মসভার পত্র চাটাচাটি হইতেছে আমরা তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিব আর এ পর্য্যন্ত মঙ্গল কর্ম্ম কি হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং দেশের হিত করিবেন দূরে থাকুক বরং বিপরীত হইয়া উঠিতেছে দলাদলি ব্যাপারে সাধারণের কি লভ্য আছে তাহা বলিতে পারি না।'[৬] ধর্মসভা হয়ে উঠলো 'জাতমারার' চক্র, যার সঙ্গে রাধাকান্তের যোগ সেকালে অনেকের কাছে দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মসভা নতুন কাজ হাতে পেল—বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন, এবং পরে বিধবাবিবাহ-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন। এবারের আন্দোলনেও নেতা রাধাকান্ত দেব। 'রাজা রাধাকান্ত দেব কলিকাতার শক্তিশালী সর্ব্বোন্নত সমাজপতি। তিনি বিধবাবিবাহের অযৌক্তিকতা প্রমাণ জন্য বহুবিখ্যাত পণ্ডিতের ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক ধর্ম্মসভা হিন্দুসমাজের প্রধান প্রতিনিধিস্বরূপ ছিলেন। এই সভার পণ্ডিতমণ্ডলী বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন।'[৭] ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ মার্চ বিধবাবিবাহ-আইনের বিরুদ্ধতা করে ব্যবস্থাপক সভায় যে-আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, তার উদ্যোক্তা ও প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রাধাকান্ত। ৫ জুলাই তারিখে পাঠানো আবেদনপত্রের পিছনেও রাধা-কান্তের উদ্যোগ ছিল। তারপর আইন পাশ হলে 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে' গানটি রচিত হয়, তার দুটি পংক্তি লক্ষণীয়—'রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কো সই / লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক-লাজভয়ে।'

কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর বক্তৃতায় বিশেষভাবে সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্-সমিতি প্রস্তাবিত বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইনের বিরুদ্ধতার জন্য রাধাকান্ত সম্বন্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।—'১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে এই সভা বহুবিবাহ নিবারণের নিমিত্ত ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় সর্ব্বপ্রথম আবেদন প্রেরণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার বহুবিবাহবিষয়ক পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে,

কিশোরীচাঁদই সর্ব্বপ্রথম বন্ধুবর্গ হইতে এই গর্হিত প্রথার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপক-সভায় আবেদন প্রেরণ করেন। রক্ষণশীল হিন্দুদিগের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এই আবেদনের বিরুদ্ধে আর একখানি আবেদন করেন।'[৮] কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং সে সময়ে আরও অনেকের ধারণা হয়েছিল, রাধাকান্তের প্রতিবাদের ফলেই সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্‌সমিতির প্রস্তাব সরকার অগ্রাহ্য করেছিলেন। অন্যদিকে ধর্মসভাও একে মনে করেছিল তাদের বিজয়, যেজন্য তারা বিধবাবিবাহ-আইন প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন ভেবেছিলেন।

ধর্মসভা শুধু সতীদাহ সমর্থন, বিধবাবিবাহ বিরোধিতা ও বহুবিবাহ তথা কৌলীন্যপ্রথার পোষকতা করে নি, বেথুনের উদ্যোগে মেয়েদের স্কুলস্থাপনে বাধা দিয়েছে। রাধাকান্ত তাঁর গৃহে মেয়েদের জন্য পাঠশালা স্থাপন করলেও 'প্রকাশ্য বালিকাবিদ্যালয়ে' 'কন্যাদের প্রেরণ মর্যাদাহানিকর' বলে মনে করতেন। তাঁর ধারণা ছিল বিয়ের আগে ৮/৯ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েদের বাড়িতে পড়াশোনা করা ভালো, অথবা সমাজে অপাংক্তেয় অসম্ভ্রান্ত জাতির মেয়েদের পড়াশোনা চলতে পারে কিন্তু বেথুনের উদ্যোগ এই দুয়েরই বিরোধিতা করেছে। রাধাকান্ত জানিয়েছেন, 'সেই হেষ্টিংসের আমলেই প্রকাশ্য বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা হয়। কিন্তু তদবধি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই এরূপ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ মর্যাদাহানিকর বলিয়া মনে করিয়া আসিতেন।...আমার আশঙ্কা হয়, শিক্ষকগণ, ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের কন্যাদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীরূপে পাইবেন না।...ইহা হইতে এখন পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, বালিকাদের জন্য সাধারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হিন্দুদের বিরূপ মনোভাব নূতন নহে, বিদ্যালয় স্থাপয়িতাদের প্রতি ঈর্ষামূলক মনোবৃত্তি হইতেও ইহা উদ্‌ভূত হয় নাই।'[৯] 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় 'কেষাঞ্চিৎ মতস্থ হিন্দুনাং' স্বাক্ষরিত পত্র থেকে ধর্মসভার চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে, যেখানে রাধাকান্তকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে—'বুদ্ধি বিদ্যা বিজ্ঞতায় পরিপক্ক প্রশংসিত সাহেব [বেথুন] যদভিপ্রায়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিয়াছেন তাহা অস্মদাদির অগোচর নাই, তবে কি কারণ স্ত্রী জাতির বিদ্যাশিক্ষা প্রাচীন রীতি ও রাজা রাধাকান্ত দেবের অভিমত পদ্ধতিক্রমে হইতেছে বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন যদি পূর্ব্ব রীতি ক্রমেই বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়া থাকে তবে কি জন্যই বা সামান্য লোকের বালিকোপেক্ষা করিয়া ভদ্রকুলবালার নিমিত্তে ব্যাকুল হইয়াছেন…উক্ত রাজার মতানুসারে স্কুলবুক সোসৈটীতে বহুকাল পূর্ব্বে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে আমরা তাহা পাঠ করিয়া জানিয়াছি তাহাতে কালেজে পাঠাইয়া বিদ্যা শিক্ষার ও বিবির নিকট শিল্পকার্য্যাভ্যাসের বিধি নাই কেবল অন্তঃপুরে শিক্ষার কথাই লিখিত আছে…।'[১০] রাধাকান্তের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে বেথুনের প্রয়াসের প্রভেদ এখানে স্পষ্ট হয়েছে।

রাধাকান্ত দেব ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের অন্যতম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। হিন্দু কলেজ পরিচালনায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনা কতটা আধুনিক শিক্ষার অনুকূল ছিল তা বলা মুসকিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওকে বিতাড়নের ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাধাকান্ত দেব। হিন্দু কলেজ কমিটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, 'Baboo Radha Canto Deb stated that he considered Mr. Derozio a very improper person to be intrusted with the education of youth.'[১১] ডিরোজিওর আত্মপক্ষসমর্থন এবং পদত্যাগপত্র পর্যন্ত রাধাকান্ত বিবেচনা করতে সম্মত হন নি, তাঁর কাছে 'As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation, they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public ground.'[১২] আসলে হিন্দু কলেজের 'হিন্দুত্ব' রক্ষায় রাধাকান্ত অতিরিক্ত তৎপর ছিলেন (পরবর্তীকালে তিনি হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন); এই নিয়েই শিক্ষা-কমিটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর 'তুমুল বাদানুবাদ' এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুন কলেজ কাউন্সিল থেকে

তাঁর পদত্যাগ, রাধাকান্তের নিজের ভাষায় 'after an interchange of many angry minutes between myself and the late President [Mr. Bethune] my feelings were so exasperated that I was oblized to dissolve my connection with the institution.'"[৩]

সরকারি নীতিনিয়মের সঙ্গে রাধাকান্তের বিরোধ এই প্রথম ঘটে নি ; ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী সভার সভাপতি হিসাবে তিনি লাখেরাজ সম্পত্তির উপর কর বসানোর প্রতিবাদ করেছেন ; ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসাবে বিশেষভাবে জমিদারদের পক্ষে ক্ষতিকর এমন আইনের বহুবার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মসভার অধ্যক্ষ হিসাবে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারি আইন বা বিধিনিষেধের বিরোধিতা করেছেন ; বিশেষভাবে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'লেক্স লোসি' আইনের বিরুদ্ধে রাধাকান্তের নেতৃত্বদানের কথা স্মরণীয়। কিন্তু সেই সঙ্গে রাধাকান্ত সব সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন তাঁর আদি অকৃত্রিম রাজভক্তির কথা, এবং কোনো অবস্থাতেই রাজদ্রোহিতা তাঁর কাছে সমর্থনীয় মনে হয় নি। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২১ শে ফেব্রুয়ারি লর্ড অকল্যাণ্ডের দরবারে নিমন্ত্রিত ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে রাধাকান্ত বলেন, 'As this Durbar is held by your Lordship in honor of the birth of a prince and heir-apparent to the British throne, as well as that of your Lordship's approaching departure to England, we, Her Majesty's most dutiful and loyal subjects privileged to attend the Durbar, as well as the Vakeels of the Foreign Courts, embrace this favorable opportunity to offer our most respectful and cordial congratulations on this auspicious and joyful occasion, and to return our most sincere thanks for the honorary dresses, jewels, &c., conferred upon us by your Lordship in

honor of this happy event.'[১৪] লর্ড ড্যালহাউসি ভারতবর্ষে এসে প্রথমে রাধাকান্ত সম্বন্ধে কিছুটা বিরূপ হয়েছিলেন—'এক সময়ে [১৮৪৮] যখন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রতি মনুষ্য হত্যার অপবাদ হইয়াছিল তখন এই লার্ড এই রাজার বিপক্ষে কি না করিয়াছেন ? আমরা শুনিয়াছি লার্ড বাহাদুর অত্যন্ত ক্রোধপূর্ব্বক ডাম্পীয়র সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, তুমি সাবধানে দেখিবা রাজা রাধাকান্ত যেন রাজদণ্ডের হস্ত ছাড়া না হয় ইহার উপযুক্ত দণ্ড হইলেই এতদ্দেশীয় দুরন্ত লোকেরা দণ্ড ভয়ে ক্ষান্ত হইবেক।'[১৫] কিন্তু ড্যালহাউসি যখন ভারত ছেড়ে চলে গেলেন [১৮৫৬] তখন রাধাকান্তের প্রতি 'অত্যন্ত স্নেহভাব' প্রদর্শন করেন এবং 'ইহাতে রাজা বাহাদুর আপ্যায়িত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।' 'সম্বাদ ভাস্কর'-এর সম্পাদক অবশ্য ব্যাখ্যা করেছে 'আমরা বোধ করি অভিমানী লার্ড বাহাদুর বিনাকারণে রাজা বাহাদুরকে মায়াজালে আবদ্ধ করিতে আইসেন নাই, শ্রীযুক্ত লার্ড দেখিলেন বাঙ্গালিরা তাঁহাকে সুখ্যাতি পত্র দিলেন না⋯ইহাতে শ্রীযুক্ত লার্ড স্বদেশে যাইয়া দেখাইতে পারিবেন না এতদ্দেশীয় লোকেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, এই কারণ রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে অমায়িক বন্ধুভাব দেখাইলেন যদি রাজা বাহাদুর এতদ্দেশীয় প্রধান লোক সকলকে আবাহন করিয়া একটা সভা করেন আর ঐ সভা শ্রীযুতকে প্রতিষ্ঠা পত্র দেন⋯।'[১৬] বলাবাহুল্য এই ধরনের একটা দেনাপাওনার সম্পর্ক রাজপ্রতিনিধি ও রাজভক্তদের মধ্যে স্বাভাবিক ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা' হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য এক সভা করেন। সভাপতিত্ব করেন রাধাকান্ত,—'সভায় সিপাহীদের বিদ্রোহকে নিন্দা করিয়া এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।'[১৬] 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি মুদ্রিত হয়—'১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত

হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়। ২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোন রূপ সহায়তা না করাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা একাল পর্য্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্দারা তাহা আরো সংপুর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। ৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই। ৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।'[১৭] তারপর সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে 'শ্রীশ্রীমতী বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যোৎসব উপলক্ষে ১ নবেম্বর [১৮৫৮] সোমবার বৈকালে এবং যামিনীযোগে এতন্মহানগরে মহামহা মহোৎসব অপেক্ষা মহাব্যাপার হইয়াছিল'[১৮], সেই অনুষ্ঠানে শুধু রাধকান্ত উপস্থিত ছিলেন না, তিনি তার আগেই তাঁর নিজের বাড়িতে সিপাহীদের দমন তথা পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশের জন্য 'রাজকীয়' উৎসবের আয়োজন করলেন, 'In commemoration of the re-capture of Delhi in 1858, the relief of Lucknow, and the assumption of the empire of India by Her Majesty, the late Rajah gave a ball and supper, which are yet vivid in the memory of those who attended them, and took part in them.'[১৯] 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় এই 'বল'-নাচের আসরের বিশদ বিবরণের সূচনায় লেখা হলো, 'This is the first demonstration of loyalty, in so remote a dependency of the Crown of Great Britain, offered to the public *by the feeling*

and spirit of a native subject : but it is not exactly the *first* time that the Rajah's Halls have responded to the voice of triumph and gratulation.'[২০] (ইট্যালিক্স মূল রচনায় আছে)। রাজভক্তি প্রদর্শনের এই যেমন প্রথম প্রয়াস নয়, তেমনি শেষ নিদর্শনও নয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২২ ও ২৩ অক্টোবর রাধাকান্ত আবার তাঁর বাড়িতে আলোকসজ্জা ও আতশবাজির বিরাট আয়োজন করেন, উপলক্ষ 'To celebrate the Restoration of Peace in India'। বলাবাহুল্য এবারও সঙ্গে ছিল 'বল'-নাচ এবং আহার্য ও পানীয়ের আয়োজন। এই সঙ্গে মনে পড়বে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮ জুলাই মহারাণী 'fully appreciating the loyalty' 'graciously pleased to confer on Raja Radhakanta Bahadur, a distinguished mark of Royal favor by the gift of a splendid gold medal...'[২১] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই. উপাধিদানকালে বড়লাট লেখেন 'we are desirous of conferring upon you such a mark of our Royal Favour as will evince the sense we entertain for your person and the services which you have rendered to our Indian Empire, we have thought fit to nominate and appoint you to be a Knight Commander of Our Most Exalted Order of the Star of India.'[২২] উনিশ শতকে বাঙালি 'রাজা' যে রাজভক্তি প্রদর্শন করবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বরং রাজানুগত্যের জন্য গর্ববোধই স্বাভাবিক। রাধাকান্তের মৃত্যুর পর পুত্র রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব যখন পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করেন তখন সেই পুস্তিকার একটি প্রধান অংশের শিরোনাম 'Evidences of loyalty to the British Throne.'

মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর (মৃত্যু ১৭৯৭) তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের কনিষ্ঠ

পুত্র গোপীমোহনকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গোপীমোহন শুধু নবকৃষ্ণের বিষয় সম্পত্তির ভাগ পান নি, তিনি নবকৃষ্ণের জীবনধারা ও চিন্তাভাবনার উত্তরাধিকারীও বটে। রাজা গোপীমোহন বাহাদুরের (মৃত্যু ১৮৩৭) পুত্র রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। রাধাকান্তের জীবিতকালে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র সম্পাদকমণ্ডলী রচিত যে সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাতে সঙ্গতকারণেই মন্তব্য করা হয়েছিল, 'From his ancestors, Radhakanta Deva has inherited a profound esteem for the British Government, and has laboured successfully in his sphere, to further its views and objects.'[২৩] নবকৃষ্ণের সুবৃহৎ জীবনী লিখেছেন সেকালের বিখ্যাত লেখক, বাগ্মী ও আইনজীবী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ; লিখেছেন না বলে বলা উচিত নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকারীরা তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছেন, অর্থাৎ জীবনীগ্রন্থটি দেবপরিবারের অতীত গৌরবকীর্তির মুদ্রিত সাক্ষ্য। এই বই থেকে আমরা জানি, নবকৃষ্ণ অতি তরুণ বয়সে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের ফার্সী-শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন, এবং অল্পদিনের মধ্যে তাঁর কর্মকৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে ইংরাজেরা তাঁকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুন্সী পদে নিযুক্ত করেন (১৭৫৬), তারপর হেস্টিংস এবং ক্লাইভের মুন্সী হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও বিত্ত অর্জন করেন। নগেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'He supplied material information to the Company of the Nabob's movements at Moorshedabad, and supplied provision to them at the risk of his own life··· No loyalty to the Company could be deeper than that of Nubkissen's, for it commenced in the hour of their distress and despair.'[২৪] সম্ভবত এরই পুরস্কার হিসাবে নবকৃষ্ণ হেস্টিংসের মুন্সী নিযুক্ত হলেন। তারপর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'When Serajuddowlah made preparations for a second attack on Calcutta, he

encamped in Amir Chand's garden, now called Halsibag. Colonel Clive deputed Nubkissen and an Engineer to obtain information in regard to the particulars of Nabob's encampment under the pretence of making proposals of peace and offering presents to the Nabob. They brought with them a detailed account of the situation. Clive marched his forces up to the Nabob's camp at the end of the night and blew up his tent.…'[২৫] ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচর-বৃত্তির এই রোমাঞ্চকর বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা হিসাবে নগেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন রাজা রাধাকান্তের নিজের লেখা বা অনুমোদিত বিবরণের, এবং মন্তব্য করেন, 'Sir Raja Radhakanta Deb could not have sought to glorify the founder of his family by investing him with the functions of a spy.'[২৬] সুতরাং নবকৃষ্ণ ইংরেজের 'স্পাই' হতে পারেন না। আর যদি নবকৃষ্ণ 'স্পাই' হয়েও থাকেন, তাতে অগৌরবের কিছু নেই, কারণ 'Nubkissen may have been for once a spy, but he was never an Ephialtes. His mission was not to betray his masters, but to aid them. His acceptance of the mission was an act to courageous loyalty and not of meanness.'[২৬] নগেন্দ্রনাথ এমন কি একথাও বলেছেন, ক্লাইভের মনে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যস্থাপনের কোনো ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল না, নবকৃষ্ণই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থাপনের কথা ভেবেছেন এবং তার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন, 'There are reasons to believe that the inspiration of empire came from Nubkissen, who practically discharged all the functions of a diplomatic minister, of a Foreign Secretary, and of the Chief Officer of an Intelligence

Department.'[২৭] বলাবাহুল্য রাধাকান্ত যখন এমন পূর্বপুরুষকে নিয়ে গর্ববোধ করেন তখন বোঝা যায় পিতামহের উত্তরাধিকারী হিসাবে পৌত্রের মধ্যে রাজানুগত্য কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

পিতা গোপীমোহনও ইংরেজ শাসনের আনুকূল্য করেছিলেন, যার জন্য ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে লাটসাহেবের হাত থেকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব পান। তারপর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে গোপীমোহনের মৃত্যু হলে রাধাকান্ত পেলেন 'রাজা বাহাদুর' খেতাব। এ একেবারে পুরুষানুক্রমিক প্রাপ্তিযোগ। সভাবাজারের রাজবাড়িতে এক সময় হেস্টিংস ও ক্লাইভ আসতেন, পরে গোপীমোহন এবং রাধাকান্তও বড়লাট-ছোটলাট থেকে শুরু করে সাহেবসুবোদের নিয়মিত নাচগান খানাপিনার আসরে আপ্যায়ন করতেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর রাধাকান্তের গৃহে তাই উৎসব-অনুষ্ঠান কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। আমাদের মনে পড়বে "The *Dewan Khana* halls in the Old Rajbari were built by the Maharaja [Nabakrishna] to commemorate the victory of Plassey, and Lord Clive attended at their opening and at the festivities celebrated on the occasion.,'[২৮] নগেন্দ্রনাথ ঘোষও নবকৃষ্ণ-জীবনীতে লিখেছেন, 'Apart from the Puja entertainments, parties were especially held for bringing together representatives of the European and Native communities. Those held in commemoration of the battle of Plassey were generally honoured by the presence of Clive so long as he was here, of the Governor-General of the time, of members of Council and of other leading Englishmen, official and non-official.'[২৯]

রাধাকান্তের 'সমাজপতি'র ভূমিকাগ্রহণও কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। নবকৃষ্ণ প্রভৃত বিত্ত ও ক্ষমতা অর্জন করলেও বোধহয় কায়স্থকুলাধিপতি হয়ে উঠতে

পারেন নি, তাই সুপরিকল্পিতভাবে অনেক চেষ্টায় তিনি তখনকার কায়স্থদের 'গোষ্ঠীপতি' গোপীকান্ত সিংহের কন্যার সঙ্গে পৌত্র রাধাকান্তের বিবাহ দেন, যার ফলে রাধাকান্ত হলেন 'কারিকা' অনুসারে ত্রয়োদশ গোষ্ঠীপতি—সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সর্বাগ্রে মাল্যচন্দনের অধিকারী। নবকৃষ্ণ অবশ্য ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেন নি, সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন পুত্র গোপীমোহন।[৩০] রাধাকান্ত এক্ষেত্রে পিতার অনুগামী এবং সহযোগী। সতীদাহের পক্ষাবলম্বনে আন্দোলনে রাধাকান্তের থেকে গোপীমোহনের ভূমিকা কম ছিল না। নবকৃষ্ণ সামাজিক রীতিনীতি রক্ষার ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্থির সমাজে এবং ততোধিক অস্থির জীবনে তাঁর পক্ষে হয়তো পুরোপুরি অনুশাসনসর্বস্ব জীবন কাটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম থেকে সামাজিক স্থিতাবস্থা দেবপরিবারকে অতীত সংরক্ষণে অতিরিক্ত আগ্রহী করে তোলে। রাধাকান্তের পুত্রও সম্ভবত ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সামাজিক মতামত নিয়ে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেছেন। তা না হলে পুত্রসম্পাদিত রাধাকান্তের জীবনীতে এমন কথা বলা হতো না—'The superstitious element which had been mild in his father, Rajah Gopeemohan, and torpid in his uncle, Rajah Rajkissen, assumed in him an aggressive dovelopment. It is, therefore, not to be wondered at, that his attachment to the antiquated customs and usages of his country was as devoted as his advocacy of educational measures was jeolous. In him, the argument had a strong hold that what has lasted a long time must be right, and was intended to last. The reverence for existing usages which is strong in human nature was stronger in Radhakanta Deb. His belief in the wisdom in his ancestors was unlimited···Was it possible that the Bengal

of Moonshee Nobokrishna could be revived in the midst of the intellectual civilization and Europeanization of the present age ? But this impossibility does not seem to have occurred to Radhakanta Deb. He could not accept or realise the revolution that was going on around him. He was surprised and grieved to find customs and institutions, which had been consecrated by immemorial usage, subjected to a strict scrutiny, and Hinduism itself summoned to the bar of reason. He was scandalised to see liberties in thought and action assumed in broad day-light, which have been condemned by his father and grand-father as pestilential heterodoxy.'[৩১] রাধাকান্তের জীবনীকার এর পর তাঁর 'mistaken prejudice'-গুলির তালিকা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন এগুলি 'was in reality exercising a retrogressive influence on society.' জীবনীকার জানতেন, রাধাকান্তের আত্মীয়পরিজন ও ভক্তদের কাছে কথাগুলি কঠোর এবং অবিবেচনাপ্রসূত মনে হতে পারে, কিন্তু 'What we have said, we have said in the interests of truth and principle.'[৩২]

রাধাকান্তের সভায় পণ্ডিতদের সম্মানদান এবং গৃহে গ্রন্থাগার রচনাও নবকৃষ্ণের উত্তরাধিকার। নবকৃষ্ণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং তিনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রাধাকান্ত তর্কবাগীশ, শ্রীকণ্ঠ, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর প্রভৃতি পণ্ডিতদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। সংস্কৃত এবং ফারসী দুষ্প্রাপ্য পুথি সংগ্রহে ও নকলে নবকৃষ্ণের বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাধাকান্তের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরির একটা বড়ো অংশ পিতামহের তৈরি বলা যায়—'Hence, the library which he has bequeathed to his heirs, may be deemed

to be the priceless jewel amongst his treasures.'[৩৩]

এইভাবে রাধাকান্তের জীবন ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তিনি যে নিন্দা ও প্রশংসা পান, তার অনেকটাই পিতামহ নবকৃষ্ণের প্রাপ্য। অথবা বলা উচিত, রাধাকান্তকে যে কারণে আজকের দিনে অনেক সময় নিন্দা করা হয়,—তাঁর রাজভক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ,—তার জন্য তিনি পুরোপুরি দায়ী নন। পরিবেশ-পরিজনের প্রভাব ব্যক্তিজীবনে অনতিক্রম্য। রাধাকান্তও সভাবাজার রাজবাড়ির সন্তানরূপেই বিচার্য, তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। তিনি যদি যুগের এবং পরিবারের প্রভাব কাটাতে পারতেন তাহলে তাঁর মাহাত্ম্য নিশ্চয় অনেক বাড়তো। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। এখানে তাঁর সীমাবদ্ধতা। রাধাকান্তের ঐতিহাসিক পরিচয় গ্রহণকালে এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে। একে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করা অন্তত ঐতিহাসিকের পক্ষে সমীচীন কাজ নয়।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৯১ বর্ষ, ২-৪ সংখ্যা, ১৩৯১।

১. *Rajah Sir Radhakant Deb Bahadur, K.C.S.I. A Brief Account of His Life and Character.* Edited by his son, Rajah Rajendra Narayan Deb Bahadur. Calcutta, 1880 পৃ. ৫১ (পরে 'রাজেন্দ্রনারায়ণ' নামে পুস্তিকাটি উল্লিখিত হবে)।

২. David Kopf. *British Orientalism and the Bengal Renaissane,* Calcutta, 1969, পৃ. ১৯৩-৯৬।

৩. 'সমাচার চন্দ্রিকা পত্র হইতে নীত,' সমাচার দর্পণ, ৮ আগস্ট ১৮২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৩৯, পৃ. ১৪৭ (পরে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' বইটি 'ব্রজেন্দ্রনাথ' নামে উল্লিখিত)।

৪. দ্র. সমাচার দর্পণ, ২৩ জানুয়ারি ১৮৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ, ১, পৃ. ১৪৯।

৫. দ্র. সমাচার দর্পণ, ৩১ জুলাই ১৮৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ, ৩, (১৩৪২), পৃ. ৩১৫।

৬. দ্র. সমাচার দর্পণ, ৪ এপ্রিল ১৮৪০। ব্রজেন্দ্রনাথ, ২ (১৩৪০), পৃ. ৩৯৪।

৭. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃ. ২৭৮।

৮. মন্মথনাথ ঘোষ, কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, ১৩৩৩, পৃ. ১০৭।

৯. দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২০), কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ, ৩০-৩২।

১০. সম্বাদ ভাস্কর, ২৯ মে ১৮৪৯। বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৪, পৃ. ৪০৮।

১১. দ্র. *Henry Derozio by* E. W. Madge, Subir Ray Choudhuri, *ed.* Calcutta, 1982. পৃ. ৬৬।

১২. দ্র. যোগেশচন্দ্র বাগল, রাধাকান্ত দেব, পৃ. ১২।

১৩. তদেব, পৃ. ১৭।

১৪. রাজেন্দ্রনারায়ণ, পৃ. ১২।

১৫. সম্বাদ ভাস্কর, ৮ মার্চ ১৮৫৬। বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র, ৩, পৃ. ৩০৮-০৯।

১৬. সংবাদ প্রভাকর, ২৬ মে ১৮৬৭। বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, ১৯৬২, পৃ. ১৫৩।

১৭. সংবাদ প্রভাকর, ২৬ মে ১৮৫৭। তদেব, পৃ. ২২৩।

১৮. সংবাদ প্রভাকর, ২১ জুলাই ১৮৫৮। তদেব, পৃ. ২৪৪।

১৯. রাজেন্দ্রনারায়ণ, পৃ. ১৪।

২০. তদেব, পৃ. ১৫-১৬।

২১. *A Rapid Sketch of the Life of Raja Radhakanta Deva*

Bahadur, with some notices of his ancestors, and testimonials of his character and learning, by the Editors of the Raja's Sabdakalpadruma. Calcutta, 1859. পৃ. ৫৫। (পরে 'র‍্যাপিড স্কেচ' নামে উল্লিখিত)।

২২. রাজেন্দ্রনারায়ণ, পৃ. ২২।

২৩. র‍্যাপিড স্কেচ, পৃ. ১৭।

২৪. N.N. Ghose, *Memoirs of Maharaja Nubkisen Bahadur*, Calcutta 1901. পৃ. ১৪ (পরে 'মেময়ার্স' নামে উল্লিখিত)।

২৫. তদেব, পৃ. ১৫।

২৬. তদেব, পৃ. ১৬।

২৭. তদেব, পৃ. ২৪।

২৮. Loke Nath Ghose, *The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars, &c.* Part II, Calcutta, 1881. পৃ. ৯৩ (পরে 'লোকনাথ ঘোষ' নামে উল্লিখিত)।

২৯. মেময়ার্স, পৃ. ১৮৩।

৩০. র‍্যাপিড স্কেচ, পৃ. ৯৫।

৩১. রাজেন্দ্রনারায়ণ, পৃ. ৯।

৩২. তদেব, পৃ. ১০।

৩৩. লোকনাথ ঘোষ, পৃ. ৯৩।

ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, ভবতোষ দত্ত, রাজা রাধাকান্ত দেব, কলিকাতা, সাহিত্যিকা, মাঘ ১৩৯৯।

২

'সংবাদ প্রভাকর' ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

"কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়।"

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ॥)

"পুরাতন ঐতিহ্যে বাঁধা তাঁর লেখনী নতুন সমাজের পটে যে আঁচড় কেটেছিল, সেটাই বিস্ময়কর ঘটনা। হয়তো সে আঁচড়ে মহাকাব্যের রূপ নেই, কিন্তু কবির লড়াই-এর কবি, প্রথাসিদ্ধ খাদ্যবর্ণনার কবি, প্রণয় বা পরমার্থের লেখক যে সংবাদ প্রভাকরের চক্ষুষ্মান সম্পাদক ছিলেন, এ তথ্য আমাদের কাছে মূল্যবান।"

(বিষ্ণু দে, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', জনসাধারণের রুচি)

'সংবাদ প্রভাকর' (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) পত্রিকা প্রকাশের আগেও বাঙালি-প্রচারিত সাময়িকপত্র দেখা গেছে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) সম্পাদিত পত্রিকা সম্বন্ধেই সেকালে এমন কথা শোনা গেছে—"আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈবশক্তি বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখকমণ্ডলীও আহ্লাদ ও উৎসাহপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্র ভূষিত করেন।" (স. প্র., ২৩ মে ১৮৫৭। সা. বা. স. ১, পৃ. ২২১)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো একজন প্রতিভাবান কবি সংবাদপত্র পরিচালনাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন—তথ্য বিচারে ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। অসুস্থ অবস্থায় শেষ জীবনে তিনি লিখেছেন,

"নিতান্ত পদানত হইয়া নিরন্তর কাহারো তোষামোদ করিতে পারি না, কারণ

প্রথমাবধি তাহা অভ্যাস করা হয় নাই, এজন্য মনে প্রবৃত্তিই জন্মে না, দুঃখে হউক, সুখে হউক, আপনার ভাবে আপনিই থাকি…ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, পরে যাহা হইবার তাহাই হইবে, তবে আক্ষেপ এই যে, এদেশে ধনির মধ্যে যথার্থ অনুরাগি উৎসাহদাতা মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, এবং বিষয়িদিগের শ্রেণীতেও অদ্যাপি তদ্রূপ হয় নাই।

"এই সংপূর্ণ সংশয়সূচক সঙ্কটের সময়ে যদি দৈহিক ও মানসিক শ্রম পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন এই রচনার কর্ম্ম হইতে অবসৃত হই, বোধ করি তবে ঈশ্বরেচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিলে এদিগে আবার কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতে পারে না, আয়ের পক্ষে হানি হইলে ব্যয়ের ব্যাঘাতে মূলে আঘাত হইবার সম্ভাবনা, কারণ রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহের লঘুতার জন্য বিজ্ঞাপনের বিস্তর হানি হইয়াছে, পূর্ব্বের আয়ের সহিত তুলনা করিলে এইক্ষণে কিছুই নাই বলিলেই হয়। আট ভাগের এক ভাগো দেখিতে পাই না, সংপ্রতি শুদ্ধ গ্রাহকগণের ভরসার উপরেই ভর করিতে হইয়াছে, গ্রাহকদিগের মধ্যে যিনি মূল্যদান কল্পে যে প্রকার কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার আর অবিদিত কি ?…

"অধুনা আমার দুইদিগেই প্রাণ লইয়া টান পড়িয়াছে, যদিস্যাৎ নিয়তই এইরূপ পরিশ্রম করি, তবে কোনমতেই দেহ রক্ষা পায় না, আর যদি পরিশ্রম না করি, তবে উপজীবিকার হানি হইয়া যতদূর অবধি কষ্ট হইতে পারে তাহাই হইবে, এমত কিছুই সম্ভাবনা নাই, যে, তদ্দ্বারা অনায়াসেই চলিতে পারে, পূর্ব্বে বিবেচনা করি নাই, সাবধান হই নাই এবং মানুষ চিনিতে পারি নাই, এইক্ষণে দৈহিক ও বৈষয়িক উভয় বিষয়ক দুঃসময়ে তাহার উপযুক্তই বিলক্ষণরূপ ফলভোগ হইতেছে।" (স. প্র., ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬। সা. বা. স. ১, পৃ. ৪৪১-৪২)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী থেকে আমরা জানি, পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত দরিদ্র ছিলেন। দশ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর ঈশ্বরচন্দ্র জন্মস্থান কাঁচরাপাড়া থেকে কলিকাতায় মাতুলালয়ে আশ্রয় পান। শৈশবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ বেশি

পান নি, যেটুকু পেয়েছিলেন তারও সদ্ব্যবহার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়াশুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত।" কলিকাতায় অবস্থানকালে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিচয় ঘটে। যোগেন্দ্রমোহনের অর্থানুকূল্যেই 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। সেদিক থেকে এদেশে ধনীদের মধ্যে যথার্থ অনুরাগী উৎসাহদাতার অভাব সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্ষেপ সত্য নয়। তবে যোগেন্দ্রমোহনের অল্প বয়সে আকস্মিক মৃত্যু পত্রিকা প্রকাশে বিঘ্ন ঘটায়। ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে ১৮৩২ সালের ২৫ মে সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম পর্ব। চার বছর পরে বারত্রয়িক (সপ্তাহে তিন বার) 'সংবাদ প্রভাকর' পুনঃপ্রকাশিত হলো ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট। এবার পত্রিকা প্রকাশে পাথুরিয়াঘাটার কানাইলাল ঠাকুর এবং গোপালচন্দ্র ঠাকুর 'যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান' করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম পর্ব প্রকাশ রহিত হওয়ার পর ১৮৩২ সালের ২৪ জুলাই ঈশ্বরচন্দ্র আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন—'সংবাদ রত্নাবলী', যার পিছনে ছিল ধর্মসভার অন্যতম নেতা আন্দুলের জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের আনুকূল্য ('সংবাদ রত্নাবলী'কে সে কালে অনেকে ধর্মসভার মুখপত্র বলেছেন)। এরপর ঈশ্বরচন্দ্রকে আমরা আরও দুটি সাপ্তাহিকপত্রের সম্পাদক হিসাবে দেখেছি—'পাষণ্ডপীড়ন' (২০ জুন ১৮৪৬) এবং 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' (আগস্ট ১৮৪৭)। 'পাষণ্ডপীড়ন' পত্রিকাটি দেখবার সুযোগ আমরা পাই নি। পত্রিকার নামটি ঈশ্বরচন্দ্র গ্রহণ করেছেন রামমোহন-বিরোধী কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের 'পাষণ্ডপীড়ন' [১৮২৩] গ্রন্থ থেকে,

যে-গ্রন্থের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ—"বাবু উমানন্দ ঠাকুর, যিনি নন্দলাল ঠাকুর নামে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি পাষণ্ডপীড়ন প্রভৃতি যে কয়েকখানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা সর্ব্বাংশেই উত্তম অর্থাৎ শব্দের লালিত্য ও মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য সর্ব্বদিগেই উত্তম হইয়াছিল ; তাদৃষ্টে অনেকেই সরস রচনায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন।" (স. প্র., ১৩ মার্চ ১৮৫৪)। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদিত পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে—"ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ডপীড়ন' এবং তর্কবাগীশ 'রসরাজ' পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে।...কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই।"

তবে 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ডপীড়ন', 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকা ঈশ্বরচন্দ্রের সাংবাদিক পরিচয়ের নিদর্শন হলেও, 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক হিসাবেই তাঁর সর্বাধিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে বারত্রয়িক, অবশেষে দৈনিক (১৪ জুন ১৮৩৯)। ১৮৫৩ সালে 'সংবাদ প্রভাকরে'র গ্রাহকসংখ্যা পাঁচহাজার ছাড়িয়ে যায়। ১৮৫৩ সাল (বৈশাখ ১২৬০) থেকে মাসপয়লার 'সংবাদ প্রভাকর' 'এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে (যাকে মাসিক প্রভাকর বললে ভুল হবে না), যেখানে "সর্ব্বাগ্রে জগদীশ্বরের মহিমা বর্ণনা, নীতিকাব্য ও বিখ্যাত মহাত্মাদিগের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি গদ্য পদ্য পরিপূরিত উত্তম উত্তম প্রবন্ধ এবং সর্ব্বশেষে—মাসের সমুদয় ঘটনা অর্থাৎ মাসিক সংবাদের সারমর্ম্ম প্রকটিত" হতো।

সেকালে লেখকের সংখ্যা ছিল কম, বিশেষত 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রথম দশ-বারো বছর ঈশ্বরচন্দ্রকে অনেকটা একাই পত্রিকার জন্য যাবতীয় গদ্য-পদ্য লিখতে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য জানিয়েছেন (এ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকবার

কথা নয়)—"প্রভাকরের দ্বিতীয় বার অভ্যুদয়ের [১৮৩৬] কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশ পর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেইজন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদন ভার দান করিয়া পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।" কিন্তু সম্পাদক হিসাবে নীতি-নির্ধারণে বা রচনা-রীতি প্রচলনে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত তাঁর পদ্যগুলি পরবর্তীকালে 'মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সার সংগ্রহ' (১৮৬২) এবং 'কবিতা সংগ্রহ' (১৮৮৫) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—পদ্যের সঙ্গে যেখানে গদ্যের ভাবসাদৃশ্য আছে, সেখানে গুপ্তকবিকেই তার রচয়িতা বলে নির্দেশ করা অন্যায় হবে না। অন্যত্র কোনো কোনো রচনায় শুধু উত্তমপুরুষ সর্বনামের ব্যবহারে নয়, আত্মকথনের বিশেষ ভঙ্গিটি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাকে সুচিহ্নিত করে, যেমন বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে—"আমারদিগের লেখনী কোন ব্যক্তি বিশেষের অধীনা কস্মিনকালেই হয় নাই ও হইবে না, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও কাহারো নিকট স্বাধীনতা ও অভিপ্রায়কে বিক্রয় করিব না, সেরূপ হইলে এতকাল এরূপে আপনারদিগের নিকট এতদ্রূপ মান, সম্ভ্রম ও সমাদর প্রাপ্ত হইতাম না, এবং বৈষয়িক এত কষ্টও থাকিত না, অথচ কষ্টের সীমা থাকিত না। কোন খানেই আদর পাইতাম না, মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও পারিতাম না—হয়তো ব্যবহার ও স্বভাব দোষে কত শতবার কারাগার ক্লেশ ভোগ করিতে হইত—অস্মদাদির ধন নাই, শুদ্ধ এক মন আছে, সেই মনেতেই নিরুদ্বেগে, অলোভে, অক্ষোভে, সততই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতেছি।" (স. প্র., ১৬ জানুয়ারি ১৮৫৭। সা. বা. স. ১, পৃ. ২১৮)।

বিনয় ঘোষের মতে, "আনুমানিক ১৮৩৯-৪০ সাল থেকে প্রভাকরের পর্বান্তর হতে থাকে।" ভবতোষ দত্ত অবশ্য ১৮৩৮ সাল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মতবাদের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। পর্বান্তর বা পরিবর্তন বলতে রক্ষণশীল থেকে উদার-নৈতিক হয়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ১৮৩১ থেকে ১৮৪৭ পর্যন্ত পত্রিকাটি দেখবার সুযোগ আমরা কেউই পাই নি। ফলে এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীকে ঠিক কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। তবে যাঁদের 'অনুগ্রহে' 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রকাশ, তাঁরা ছিলেন অধিকাংশই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা। ১২৫৩ সালের ১ বৈশাখ সংখ্যায় পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকদের নামের তালিকায় পাচ্ছি—রাজা রাধাকান্ত দেব, নন্দলাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ১৮৩১ সালের ২১ জানুয়ারি 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় 'সম্বাদ তিমিরনাশক' নামে সাপ্তাহিক থেকে "কলিকাতা রাজধানীতে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রের উৎপত্তি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হয়, তাতে মন্তব্য করা হয়েছে—"সন ১২৩৭ সালের ১৬ মাঘে প্রভাকর পত্র উদয় হয় তাহার কিরণে বুঝি জগৎ আলোক হইবেক এমনি প্রখর কিরণ প্রকাশ হইল তাহার কারণ কেবল ধর্ম্মপক্ষ আশ্রয় করিয়াছিল নচেৎ তাহাতে মুন্সীয়ানা বা বিদ্যাবুদ্ধি কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই কেবল নাস্তিক-দিগকে অনেক কটু কহিয়াছিস তাহাতে হিন্দুসমাজে মান্য হইল কেননা ভদ্রলোক নাস্তিকের সঙ্গে বিবাদ করিতে কেহ বাসনা করেন না সুতরাং প্রভাকর অকুতোভয়ে অনেক পচাল পাড়িয়াছিল…।" অবশ্য 'সম্বাদ তিমিরনাশক'ও 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মতোই রক্ষণশীলদের মুখপত্র ছিল (দ্র. *India Gazette*, February 4, 1832)। আসল বিরোধ ডিরোজিওপন্থী নব্যযুবাদের সঙ্গে—যাদের সম্বন্ধে কবি ও সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত প্রথম থেকে শেষাবধি বিরূপ। তরুণদের মুখপত্রে তাই 'প্রভাকর' সম্বন্ধে এই ধরনের মন্তব্যই প্রত্যাশিত—"…the growing spirit of opposing liberalism has become very general; papers

after papers are getting up professedly for the purpose of defending the religion of the country. The *probhakar* has brought himslef to the notice of the public by the indecencies his columns abound with, and his intemperate abuses against the liberal party. His example has fired others with a desire of gaining the same influence among the orthodox community, by pursuing the track he has pointed out." (*The Enquirer*, reprinted in *India Gazette*, August 15, 1831) । ঈশ্বর গুপ্ত এই সময় কী ধরনের ভাষা ব্যবহার করতেন তার নিদর্শন— "শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তি মহাশয়ের চট্টগেঁয়ে যে অপহারক মেং বাবু কৃষ্ণা ফ্রিঙ্গি [কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] হিন্দুইউথ নামক একখানি ক্ষুদ্র দর্গার পুষ্য পুত্র পত্র প্রকাশ করিয়াছে তাহাতে পেটকো ফিরিঙ্গি কৃষ্ণা মুচি হিন্দুদিগের কি করিবেন যেহেতু তাঁহার দক্ষিণহস্ত ইনকোয়েরর পত্রেই বা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন যে এইক্ষণে ঐ বাচ্ছা পত্র আচ্ছা হইয়া হিন্দু ধর্ম্মের হানি করিবেক ভালং বন্দা জেনো তাহার সাধ্যমতে কশুর করে না কিন্তু আমারদিগের বোধ হইতেছে যে ঐ বাচ্ছা পত্র বন্দ্য বা পার অভিমতে স্বজন হয় নাই এ হায়াহীন ড্রজো [ডিরোজিও] ভায়ার কর্ম্ম কেননা ড্রজো ভায়া ইষ্টিণ্ডিয়ান ও ইনকোয়েরর পত্রদ্বারা কিছু করিতে না পারিয়া এক নেংটে ইঁদুর বাহাদুরকে প্রেরণ করিয়াছেন যেমন মহীরাবণের ব্যাটা অহিরাবণ কিন্তু হে ফিরিঙ্গি সাহেব ড্রজো ভায়া তুমি হাজার প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দর্গার থামে তাল ঠুকিয়া দলবল সঙ্গে করে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে এসো কিন্তু কালামেন বাঙ্গালিদিগের ফতে করিতে পারিবে না।" ('সংবাদ প্রভাকর' থেকে পুনর্মুদ্রিত, 'সমাচার দর্পণ', ১৯ নভেম্বর ১৮৩১। দ্র. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২, ১৩৪০, পৃ. ১৯৪)।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের (এবং শিক্ষকদের) অনাচার নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকর'

এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে কলেজ-কর্তৃপক্ষকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার কথা পর্যন্ত ভাবতে হয়। কিন্তু ধর্মসভার কর্তাদের অনাচার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা যে 'সংবাদ প্রভাকরে'র পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণে' পত্র-লেখকের কটাক্ষ ঈশ্বরচন্দ্রের সামাজিক ভূমিকা নির্দেশ করে—"প্রভাকরের অধ্যক্ষ অথচ সম্পাদক ঐ সভান্তঃপাতী এমত ব্যক্তিরদিগকে যে কিছু কহেন না ইহাতে তাঁহার অপরাধ নাই যেহেতুক তৎসম্পৃক্তেরা পাথুরিয়াঘাটাতে স্ব২ বাটীতে তদ্রূপ ভোজ নাচ করাইতেন তাহা অদ্যাপিও প্রতিবাসি লোকেরদের বিলক্ষণরূপ স্মরণ আছে অনুমান হয় যে তৎপ্রযুক্ত তাঁহারা মৌনাবলম্বী আছেন।" (সমাচার দর্পণ ৫ নভেম্বর ১৮৩১। দ্র. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২, পৃ. ১৯৪)।

পরবর্তীকালে অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে কঠোর ভাষায় ধর্মসভার সমালোচনা করতে দেখি, কিন্তু সেখানে আক্রমণের স্থল আসলে ব্যক্তিবিশেষ—"ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁক জমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না…এইক্ষণে ঘরে২ ধর্ম্মসভা, যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা বসুর গঙ্গা ইত্যাদি সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা, ফলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।" সাংবাদিকের কর্তব্য সম্বন্ধেও তিনি একই সঙ্গে মন্তব্য করেন, "স্থিররূপে বিবেচনা করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগ্যে ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধে রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, যেহেতু সংবাদপত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ, সুতরাং তাহারদিগের লেখনীকে বিষয় বিশেষের অধীনী করা কোন মতেই বিচার্য্য হইতে পারে না…।" (স. প্র., ১৬ এপ্রিল ১৮৪৮। সা. বা. স. ১, পৃ. ১৬৮)। কিন্তু কার্যত 'ধর্মঘটিত' বিষয় পরিহার করা দূরে থাক, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষায় 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক সদা সচেষ্ট থেকেছেন। 'ঈশ্ব

খ্রীষ্টী হেঙ্গমা' নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তেজনা বোঝা যায় (যদিও সেখানে তিনি ধর্মসভা সদস্যদের মতোই 'ধর্মঘটিত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ')—'ডবি স্কুলে এ বি শিক্ষিত ছাত্র'দের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি কাতর হয়ে ওঠেন, "আমরা দস্যুদিগ্যে অধিক ভয় করি না, যেহেতু তাহারা শাসনের শঙ্কা করে। পাদ্রিরূপ দস্যুগণ, শাসনের ভয় রাখে না। রাজা ঐ ঈশু ধর্ম্ম ঘোষকদিগের তোষক ও পোষক হওয়াতে ইহারা সর্ব্ব শোষক হইয়াছে।" (স. প্র., ২২ এপ্রিল ১৮৫৩। সা. বা. স. ১, পৃ. ১৯৪)। ধর্মসভা এবং ব্রাহ্মসভা এই একটি ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করতো। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুণগ্রাহী এবং একদা তত্ত্ববোধিনী সভার সদস্য হয়েও 'লেক্সলোসি আইনের' বিরুদ্ধতায় ঈশ্বরচন্দ্র ধর্মসভার সম্পাদকের সঙ্গেই মিলিতভাবে আন্দোলন করেছেন ("স্বধর্মত্যক্ত নেটিব খৃষ্টানদিগের পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার নিয়ম নির্দ্ধারণ করাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার বিজাতীয় পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা কতবার এই প্রভাকরে আন্দোলন করিয়াছি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না।"), কারণ তাঁর মনে হয়েছে হিন্দুধর্ম আজ বিপন্ন —"এই স্থলে প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতে একত্রে লজ্জা এবং দুঃখের উদয় হইতেছে, 'লেক্সলোসি' আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের মধ্যে কেহই তাহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। কেহই এক কপর্দ্দক সাহায্য করেন নাই। দেখুন যখন ঘরের মধ্যে এইরূপ হইল তখন পরের দ্বারা উপকার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে। স্বধর্ম্মত্যাগি পৈতৃক বিষয়ে স্বত্বাধিকারি হইলে কিরূপে হিন্দুত্ব রক্ষা হইতে পারে। এই নিষ্ঠুর নিয়ম নিবারণার্থ হিন্দুমাত্রেরই তুল্যরূপেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসভার মহাশয়েরা তাহাতে বিরত হইয়া উত্তমকর্ম্ম করেন নাই।" (স. প্র., ৯ এপ্রিল ১৮৫২। সা. বা. স. ১, পৃ. ১৮১)। অবশ্য ১৮৪৯ সালে ঈশ্বরচন্দ্র তত্ত্ববোধিনী সভা পরিত্যাগ করেছেন। তখন থেকে তাঁর মনোভাবে আবার কিছু পরিবর্তন ঘটে।

'ডুজো ভায়া' অর্থাৎ ডিরোজিও এবং তাঁর 'নেংটি ইঁদুর' অর্থাৎ ইয়ং বেঙ্গল-

-সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র কখনও প্রসন্ন ছিলেন না—"সোনার বাঙাল, করে কাঙাল / ইয়ং বাঙাল যত জনা। / সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে / কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা…/ ("দুর্ভিক্ষ")। শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও, তথাকথিত পর্বান্তর কালেও ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে অভিযোগ থেকেই গেছে—"যাঁহারা ইংরেজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, তাহাদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, 'ইয়ং বেঙ্গলি' যুবকদলেরা স্বদেশের কল্যাণকারি বলিয়া সর্ব্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাহাদিগের ভাষার শিক্ষা গুরুমহাশয়ের নিকট 'পরম কল্যাণীয়' পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না সন্দেহের বিষয়; অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদি সূত্রেই দোষ পড়িতেছে।" (স. প্র., ১২ এপ্রিল ১৮৪৮)। আরও পরবর্তী কালে 'হিন্দু যুবকদিগের আধুনিক মত পরিবর্ত্তনের বিশেষ কারণ' নির্দেশকালে তিনি লেখেন—"তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া ইংরাজ জাতির গুণভাগ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেবল দোষভাগ গ্রহণ করিয়াছেন, সাহেবি ধরণ, সাহেবি কথা, সাহেবি মেজাজ পাইয়াছেন, সাহেবি আহার, বিহার পরিচ্ছদ ভালবাসেন, কিন্তু সাহেবি বিদ্যা, সাহেবি বুদ্ধি, সাহেবি প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি সাহেবদিগের সদগুণ কিছুই প্রাপ্ত হয়েন নাই।" (স. প্র., ১৯ মে ১৮৫৫। সা. বা. স. ৪. পৃ. ৭৬৬)। ইংরেজ শাসন গোড়া থেকেই কাম্য বিবেচিত হয়েছে—বৈষয়িক প্রয়োজনে ইংরেজি বিদ্যার উপযোগিতাও যেন বুঝেছেন। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের কালে 'প্রভাকর' বারবার আমাদের স্মরণ করিয়া দিয়েছে—"এই স্থলে সকলে প্রণিধান করুন, ব্রিটিস অধিকার আমারদিগের পক্ষে কি প্রকার সুখের আধার হইয়াছে, অনায়াসেই অতি সহজে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপার্জ্জন, সুপথে থাকিয়া সুরীতিক্রমে বিবিধ সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নির্ভয়ে অর্জ্জিত ধনরক্ষণ, অর্জ্জিত ধনের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধি করণ।…অতএব সকলে একবার

মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের সহিত জয় প্রার্থনা কর।" (স. প্র., ১৯ জুন ১৮৫৭। সা. বা. স. ১, পৃ. ২২৮)। ইংরেজের জয় প্রার্থনার পিছনে এক ধরনের দূরদৃষ্টি কাজ করেছে সন্দেহ নেই, তা না হলে "সেই 'তাঁতিয়া তোপি'র মাথা কেটে / আমরা ধরে দেব 'নানা'।" ("দুর্ভিক্ষ") কিংবা "নানা পাপে পটু 'নানা', নাহি শুনে না, না / অধর্ম্মের অন্ধকারে হইয়াছে কাণা / ভাল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ / আগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ।" ("নানা সাহেব") কিংবা "হ্যাদে কি শুনি বাণী? / হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসীর রাণী / ঠোঁট কাটা কাকী। / মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে না কি / ...এতদিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে।" ("কানপুরের যুদ্ধে জয়") লেখা সম্ভব ছিল না এগুলি যে নিতান্ত পদ্যে লেখা পরিহাস মাত্র নয়, তার প্রমাণ মিলবে প্রায় অনুরূপ বক্তব্য নিয়ে গদ্যে লেখা সম্পাদকীয়গুলিতে। হয়তো ইংরেজ সম্পাদিত সাময়িক পত্রের প্রভাব এর পিছনে কিছুটা কাজ করেছে, কারণ সাধারণ-ভাবে 'সংবাদ প্রভাকরে' হিন্দুমহিমা প্রচারিত হলেও 'যবন'-বিদ্বেষ সিপাহী বিদ্রোহের আগে দেখা যায়নি। কিন্তু এই সময় থেকেই 'সংবাদ প্রভাকরে' 'ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রভাকরতুল্য পরাক্রম' বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে 'যবনাধিকারে' হিন্দুর দুরবস্থা এবং বিদ্রোহীদের মধ্যে 'যবনের সংখ্যাই অধিক' এবং 'অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহার-দিগের রাজভক্তির সংপূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহার-দিগের নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন," (স. প্র., ২৯ জুন ১৮৫৭) ইত্যাদি বক্তব্য প্রাধান্য লাভ করেছে।

হিন্দুর ইংরেজভক্তি তথা ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞতাবোধের ঐতিহাসিক কারণ আছে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্যের সঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের আপাত সাদৃশ্য সত্ত্বেও একটা জায়গায় মতানৈক্য স্পষ্ট। হরিশ্চন্দ্র শুধু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তিনি সেকালে সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে সর্বদাই

প্রগতিপন্থীদের পাশে ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের মতে সাহেবদের সব ভালো, কেবল হিন্দুর ধর্মেকর্মে হস্তক্ষেপ আপত্তিকর। এখানে হিন্দুর 'ধর্মকর্ম' বলতে কিছু দেশাচারকেই বুঝেছেন তিনি—"পূর্ব্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর, / অনাচারে অবিরত রত। / কোথা পূর্ব্ব রীতিনীতি, অধর্ম্মের প্রতি প্রীতি / শ্রুতি হয় শ্রুতি-পথ-হত।" ("ভারতের ভাগ্যবিপ্লব")। দৃষ্টান্ত হিসাবে চড়কের ব্যাপারে 'রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত' হলে ঈশ্বরচন্দ্রের আক্ষেপ ও উত্তেজনার উল্লেখ করতে পারি—"এই সংবাদ পাঠ করত হিন্দুমাত্রেই ভীত হইবেন, এবারে চড়কের দফা একেবারেই রফা হইবেক, সন্ন্যাসিদিগের বাণফোড়া ও চড়কে উঠা দূরে থাকুক যদ্যপি ঢাক বাজাইয়া নগর ভ্রমণ করে তবে পুলিসের লোকেরা ধরিয়া গারদে পুরিবেক, কাঁটা ঝাপ, ঝুল সন্ন্যাস ইত্যাদি কোন কার্য্যই হইবেক না। এই ব্যাপারে যদিও আধুনিক বাবুদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সন্তোষজনক বটে, ফলতঃ হিন্দু মাত্রেরই পক্ষে সাতিশয় পীড়াজনক বলিতে হইবেক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সম্পাদনে প্রজাদিগের যে স্বাধীনতা আছে রাজনিয়মের বলে তাহা হরণ করিয়া এ প্রকার মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিলে রাজার প্রতি প্রজার চিত্তের বৈলক্ষণ্য হয়, সুতরাং তাহাতে মহাবিপদ উপস্থিত হইতে পারে।" (স. প্র., ২৬ মার্চ ১৮৫৪। সা. ব. স. ১, পৃ. ১৮৫-৮৬)। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাসময় পদ্য লিখেছেন প্রচুর—"করিছে আমার ধর্ম্ম, আমাতে নির্ভর / রাজা হয়ে পরধর্ম্মে কেন দেন কর। / আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার / এত কেন মাথাব্যথা হইল রাজার। /…শাস্ত্র নয় যুক্তি নয়, হবে কি প্রকারে / দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে /…সকলেই তুসি মারে, বুঝেনাক' কেউ / সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ / সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন / তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন।" ("বিধবাবিবাহ আইন")। "অনেকেই এই মত ল'তেছে বিধান / 'অক্ষতযোনির' বটে বিবাহ বিধান। / কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে ? / একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী আছে।" ("বিধবাবিবাহ")।

গদ্যরচনায় এই মনোভাবের কি কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? ঈশ্বরচন্দ্র অদ্ব্যর্থ ভাষায় জানিয়েছেন, "আমাদিগের অভিপ্রায়ের পরিবর্তন কিছু মাত্রই হয় নাই।" তাঁর অভিপ্রায় কি?—"সর্ব্বসাধারণ বিধবাদিগের বিবাহ হয়, তাহাতে আমার অভিমত কখনই নহে, কেবল অক্ষতযোনিদিগের বিবাহ হয়।—বিবাহ-পক্ষ মহোদয়েরা ক্ষতাক্ষত প্রভেদ না করিয়া এককালে বিধবা মাত্রেরি বিবাহ বিধি করিলেন।—এ বিষয়ে কেবল যুক্তিকে অবলম্বন করাই আমার অভিমত ছিল, তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিচারকে আশ্রয় করিলেন।—এ বিষয়টী রাজনিয়মের অধীন করণে অনেকে সম্মত ছিলেন না, তাঁহারা কৌশলে ও প্রকারান্তরে তাহাই করিলেন।—প্রধান প্রধান সমাজের পণ্ডিতদিগের ও প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের সম্মত করিয়া অক্ষতযোনির বিবাহ দেওয়াই অনেকের মত ছিল, তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশের অনভিমতে অসময়ে এরূপে কার্য্যারম্ভ করিলেন যে, পরিশেষে কিরূপ অবস্থায় দাঁড়ায়, এখন তাহা স্থির করিতে কেহই সমর্থ নহেন।" (স. প্র., ১৬ জানুয়ারি, ১৮৫৭। সা. বা. স. ১. পৃ. ২১৯)। শাস্ত্রীয় বিচার, রাজনিয়ম, এবং সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তের অভাব—এই তিনটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বরচন্দ্রের আপত্তি। তাঁর মনে হয়, "শাস্ত্রীয় বিচার বড় সহজ ব্যাপার নহে, অত্যন্ত কঠিন, যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তথাচ তাঁহার সহিত বিচারে কেহই সক্ষম নহেন, তাবতেই পরাজিত হইয়াছেন ও হইবেন, এই উক্তিতে যদি আমরা সম্মতি দিয়া নীরব থাকি তবে ধার্ম্মিক ও সূক্ষ্মদর্শিজনেরা আমারদিগকে কি কহিবেন?" (তদেব)। এই আপত্তি যে শুধু তাঁর একার, এ কথা মনে করার কারণ নেই। তবে নন্দকুমার কবিরত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, পীতাম্বর সেন কবিরত্ন, রাধধন দেবশর্মা প্রভৃতি যাঁরা সে কালে বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত সর্বদা সহমত পোষণ করেন নি।

বিনয় ঘোষ বলেছেন, "সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে প্রভাকরকে উদার মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে।" ভবতোষ দত্তও প্রায় একই ভাষা ব্যবহার করেছেন, "প্রভাকর

পত্রিকার মনোভাবকে উদারপন্থী বলতে পারি।" কিন্তু দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি যখন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—"বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব তাঁর কবিতার উদ্দেশ্যহীন ব্যঙ্গ থেকে বুঝতে গেলে চলে না; গদ্য লেখাতে তিনি একটি মধ্যপন্থী মত পোষণ করে গিয়েছেন। বস্তুত এই বিষয়টিতে তাঁর কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য চোখে পড়ে না…।" (সুস্পষ্ট মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করেছি), তখন বুঝতে পারি না 'উদার মধ্যপন্থী' বলতে তাঁরা ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছেন। '১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজে অ-হিন্দু ছাত্র ভর্তি করার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্রের উত্তেজনা তো তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। ১৮৩১ সালের সঙ্গে ১৮৫৩ সালের ঈশ্বচন্দ্রের মধ্যে এই ব্যাপারে কোনো মত-পরিবর্তন দেখা যায় না। তিনি সগৌরবে লেখেন "আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন 'ড্রোজু সাহেবি' হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কালেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল এই ক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় 'মুসলমানি', 'খ্রীষ্টানি' এবং 'জারজী' এই ত্রিদোষ জন্য সেই লেখনীকে আবার কর সদনে নৃত্য করাইতে হইল।" ডিরোজিওর বিরুদ্ধে একদা অভিযোগ উত্থাপনে যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল আজ সেই একই মনোভাবের প্রকাশ ঘটলো 'হিন্দু কলেজের হিন্দুত্ব ও উচ্চগৌরব রক্ষা'র প্রয়াসে— "এই স্থলে 'হিন্দু কালেজ' এই শব্দটী উল্লেখ করিয়াই চতুর্দ্দিগ্ শূন্য দেখিতেছি, যেহেতু হিন্দু কালেজের হিন্দুত্ব আর রক্ষা হয় না। এই কালেজের (শাখা) যাহা হ্যার সাহেবের স্কুল বলিয়া বিখ্যাত, পূর্ব্বেই সেই শাখায় দুটো পোকা ধরিয়া প্রশাখা ও পল্লব পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে, তাঁহার একটী পোকা ঈশুর খোকা, একটী পোকা মহম্মদের খোকা। উক্ত পোকা কি প্রকারে কোথা হইতে আইল তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা বোকা হইয়াছি, মনের ধোঁকা কিছুতেই নিবারণ হয় না।" (স. প্র., ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩। সা. বা. স. ১, পৃ. ৩৩৭-৩৮)। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে হিন্দু দলপতিদের (তাঁরা ধর্মসভার নেতাও বটে) শুধু অর্থানুকুল্য ছিল তাই নয়, পরিচালনা ও নীতি-নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা ছিল। 'হিন্দু'

ঈশ্বরচন্দ্রের আক্ষেপের কারণ বোঝা যায় ("কেবল হিন্দুর দানে মূলধন নির্দ্দিষ্ট হইয়া হিন্দু কালেজ স্থাপিত হয় এবং কেবল হিন্দুদিগের কর্তৃত্বাধীনে ঐ কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবে এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়…"ইত্যাদি) কিন্তু তাই বলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রচারে এই ভাষা ব্যবহার 'উদার মধ্যপন্থী' সাংবাদিকের পরিচয় নয়—"এ বিবেচনা কেমন বিবেচনা তাহা বিবেচনা করিতেই পারিলাম না, যখন ব্রাঞ্চে আসিয়া গোরা হোরা মারিয়া টেবিল পাতিয়া ডেভিল প্রভুর পূজা করিতেছে। যখন দাড়ুধারী নাড়ুর পোলা আসিয়া 'ইয়া হুঁসেন, 'ইয়া হুঁসেন' বলিয়া বুক চাপড়াইয়া দুপুরে মাতন করিতেছে, তখন হিন্দু কালেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল ? হিন্দু কালেজ তো প্রকৃত খিচুড়ি কালেজ হইয়াছে, সামান্য খিচুড়ি হইলেও কথা চলিত, 'তেউটির ডেলের খিচুড়ি' যাহা হউক, বড় ঘরের বড় কথা, রিপুর কামের তালি দেখাইয়া বড়মহাশয়কে অনায়াসেই ভুলাইতে পারিবেন, কিন্তু হাবার মুখে থাবা দেওয়ার ন্যায় আমারদিগ্যে সামান্য ছলে কখনই ভুলাইতে পারিবেন না।" (স. প্র., ২১ জুলাই, ১৮৫৩। সা. বা. স. ১, পৃ. ৩৪৩)। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র বক্তব্যের সঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকরে'র বক্তব্যের এখানে কোনো বিরোধ নেই। ১৮৫৭ সালে "কানপুরের যুদ্ধে জয়" কবিতায় সাম্প্রদায়িক মনোভাব আরও প্রকট—"কেবলি মর্জি তেড়া, কাজে ভেড়া/ নেড়া মাথা যত / নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মত।"

আসলে শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলার ফলে এমন কিছু বিতর্ক গড়ে উঠেছে যা আজকের দিনে তুচ্ছ বলে মনে হয়। হিন্দুকে হিন্দুত্ব রক্ষা করতে হবে, তাই হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ, হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগকে 'চন্দ্রিকা' এবং 'প্রভাকর' উভয়েই সন্দেহের চোখে দেখেছে—কারণ সরকারি স্কুলকলেজে 'ঈশুর খোকা', 'মোহম্মদের খোকা' সকলেরই প্রবেশাধিকার। তবে স্ত্রীশিক্ষা এবং বেথুনের ভূমিকা সম্বন্ধে 'প্রভাকরে'র দৃষ্টিভঙ্গি 'চন্দ্রিকা' ও 'রসরাজ' থেকে স্বতন্ত্র। গুপ্তকবি কৌতুক করে পদ্যে লেখেন বটে—"আগে

মেয়েগুলো ছিল ভালো / ব্রত ধর্ম্ম কোর্তো সবে। / একা 'বেথুন' এসে, শেষ করেছে, / আর কি তাদের তেমন পাবে। / যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে / কেতাব হাতে নিচ্চে যবে / তখন 'এ, বি' শিখে বিবি সেজে / বিলাতী বোল কবেই কবে। / এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে / সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে / সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে / পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে।" ("দুর্ভিক্ষ")। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে'র একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বেথুনের প্রয়াসকে তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন—"আমরা স্থির নেত্রে পুরুষ জাতির বিদ্যা শিক্ষার বিবিধ উপায় অবলোকন করত যেরূপ সুখানুভব করিতাম, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার উপায়াভাব জন্য সেইরূপ দুঃখিত ছিলাম, কিন্তু মান্যবর মেং জে ই ডি বেথুন সাহেব আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণ জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি প্রথমতঃ আপনার অর্থব্যয় দ্বারা এই মহানগর কলিকাতা মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার প্রারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় দলাদলি প্রিয় মহানুভব মহাশয়েরা তাহার উন্নতির জন্য প্রতিবন্ধকতা করণে ত্রুটি করেন নাই…কিন্তু সকলের সকল প্রকার বিপক্ষতা ছিন্ন করিয়া এইক্ষণে বেথুন সাহেবের স্ত্রী বিদ্যালয় যত উন্নত হইতেছে ততই আমরা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি…।" (স. প্র., ৭ আগস্ট ১৮৫০। সা. বা. স. ১, পৃ. ৩২০)। অবশ্য বেথুনকে প্রশংসা করেছেন বলেই যে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত দ্বিধাহীন ছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগত কারণেই লিখেছেন, "স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র অনেকটা রক্ষণশীল মতেরই পোষকতা করিতেন। ২২ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' ইটালীর দুই কুলীন রমণীর ডুয়েল-যুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি স্বজাতীয়া মহিলাদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেন : রাজকীয় ব্যাপার কাহাকে বলে এদেশের স্ত্রীলোকেরা তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত নহে, কেবল দাঁটা চড়চড়ির ভুষ্টিনাশ করত গলাবাজীপূর্ব্বক কোন্দল করিয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতে নিপুণা হইয়াছেন, দেখ দেখি বিলাতবাসিনী কামিনীকুলের কেমন অনন্ত গুণ, তাঁহারা বীরভূমে উদ্ভব হইয়া

বীরভোগ্যা হইয়াছেন, সুতরাং বীরা হইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন বিচিত্র কি? দেশ, কাল, আহার ও ভোগ ইত্যাদির গুণে সকলি হইতে পারে। ফলে বঙ্গাঙ্গনাগণের মনের ভাব সেরূপ হওনের আবশ্যক করে না, ইহারা চিরকাল সাড়ী পরিয়া হাঁড়ী ধরিয়া দিনপাত করুক। আঁমরা তাহাতেই সুখি হইব, তবে সাবকাশ ক্রমে চলিত মত স্বজাতীয় বিদ্যার আলোচন যতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারে তাহাই ভাল।

বাঙ্গালির মেয়ে সব, হও বটে কালো।
পতিব্রতা ধর্ম্ম সদা, প্রতিজ্ঞায় পালো॥
দিশি বিদ্যা যাহা শেখ, সেই মাত্র ভালো।
অন্ধকারে অন্ধ থাকো, কায নেই আলো॥"

('বাংলা সাময়িক-পত্র', প্রথম খণ্ড, ১৩৭৯, পৃ. ৩৭)

এখানে লক্ষণীয়, স্ত্রীশিক্ষা বলতে ঈশ্বরচন্দ্র 'স্বজাতীয় বিদ্যার আলোচনা' অর্থাৎ 'দিশি বিদ্যা' বুঝতেন, এবং সেকালে বিক্টরিয় বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে (অর্থাৎ বেথুন স্কুলে) 'একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে [বালিকাদের] বঙ্গভাষায় উপদেশ এবং একজন সুনিপুণ বিবী সূচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান' করতেন। কাজেই 'স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কথা পঞ্চমুখে সে প্রচার করেছে' (বিনয় ঘোষ) এমন কথা 'সংবাদ প্রভাকর' সম্বন্ধে বলা ঠিক হবে না।

তবু আদি যুগের বাংলা সাময়িকপত্রের মধ্যে 'সংবাদ প্রভাকরে'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ মনে করেছেন, "সংবাদ প্রভাকরের আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তাধারার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ।" (ভূমিকা, সা. বা. স. ১)। বঙ্গভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা, বিজ্ঞানশিক্ষা-দানের উপায় নির্ধারণ, নীলকরদের অত্যাচার-সংবাদ পরিবেশন, বাঙালিকে স্বাধীন বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান, শিক্ষিত বাঙালির চাকুরি সমস্যা প্রভৃতি যে প্রসঙ্গ-

গুলি 'সংবাদ প্রভাকরে' নিত্য আলোচিত হতো তার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে। স্ববিরোধ ছিল,—পরিবর্তনের স্রোতে যখন সব কিছু ভেসে যাচ্ছে তখন ঈশ্বর গুপ্ত অনেক সময় অতীতকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন—"জাতীয় প্রচলিত রীতিনীতি ও ধর্ম্মের প্রতি যুবকদলের অবিশ্বাসের স্রোতঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তাহাতে ভয়ানক তরঙ্গরাশি উত্থিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির রীতিনীতি ও ধর্ম্ম বহুকালের বর্দ্ধিত ও গিরি মূল প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় কৃত, একারণ ঐ তরঙ্গ দ্বারা এ পর্য্যন্ত তাহারা সমূলোৎপাটিত হয় নাই পুনঃ পুনঃ আঘাতে স্রোতের হীনবলই অবধারণ হইতেছে, হিন্দু জাতি যদ্যপি ত্রিব্বৎ প্রভৃতি পর্ব্বতবাসি লোকদিগের ন্যায় অসভ্য ও অশিক্ষিত হইত তবে তাহারদিগের শাস্ত্রাদি কিছুই থাকিত না, অর্থাৎ তাহা অদৃঢ় বর্দ্ধিত বালুকার ন্যায় হইলে ঐ প্রবল তরঙ্গে তরঙ্গে এতদিনে সমূলে নির্ম্মূল হইত।" (স. প্র., ১৯ মে ১৮৫৫)। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বার ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন।" 'সংবাদ প্রভাকর' এদিক থেকে সে কাল আর এ কালের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম হয়েছিল। অন্য কোনো সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটা ঘটে নি।

তবে সবচেয়ে বড়ো কথা, আদিযুগের বাংলা সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই ছিলেন যথার্থ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য-প্রতিভাকে সাংবাদিকতা কর্মে নিয়োগ করলে হয়তো সাহিত্যসৃষ্টি সাময়িকতা লক্ষণাক্রান্ত হয়, কিন্তু সেই সঙ্গে সাংবাদিকতা কিছু পরিমাণে কালোত্তীর্ণ হতে সক্ষম হয়—সেইটুকুই লাভ। 'সম্বাদ কৌমুদী' বা 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার নাম সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লিখিত হলেও সাহিত্যের সঙ্গে সেগুলির বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকর'কে বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'সংবাদ প্রভাকরে'র প্রশস্তি রচনা করেন তখন তার মধ্যে শুধু

ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ কাজ করে নি, জাতীয় ঋণস্বীকারের আবশ্যকতাও কাজ করেছে—"বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনারি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর এক জন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।"

বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক, গণমাধ্যম কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ১৯৯৩।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সবগুলি সংখ্যা দেখবার সুযোগ আমরা পাই নি। কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে ১৮৪৯ থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র ফাইল দেখা সম্ভব হয়েছে (মধ্যে কিছু কিছু অংশ খণ্ডিত / বিনষ্ট)। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত

'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র : ১৮৪০-১৯০৫' প্রথম খণ্ড (কলিকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২) গ্রন্থে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডেও (কলিকাতা, পাঠভবন, ১৯৬৬) 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে কিছু অংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য অধিকাংশ উদ্ধৃতি নির্দেশকালে বিনয় ঘোষের বইটির (সা. বা. স.) পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। অন্যত্র 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনা-সংকলন হিসাবে এই তিনটি গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান পরিগণিত হবে :

মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, মেডিকেল লাইব্রেরী, দুই খণ্ড, ১৩০৮।

ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী, কলিকাতা, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৮।

মোহনলাল মিত্র সম্পাদিত, ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র : কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কলিকাতা, নবভারতী, ১৯৬৩।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং 'সংবাদ প্রভাকর' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১০, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৭০।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, প্রথম খণ্ড, ১৩৭৯, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, কলিকাতা, জিজ্ঞাসা, ১৯৬৮।



বিদ্যাসাগর সমসাময়িকের দৃষ্টিতে

আমাদের দেশে মহাপুরুষ বলে যাঁরা পরিগণিত, তাঁরা সহজেই অবতারত্ব লাভ করেন। বিদ্যাসাগর জীবিতকালে প্রায় সকলের কাছ থেকে মহাপুরুষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যদিও বিদ্যাসাগরের তিরোধানের কয়েক বছর পরে লেখেন, কিন্তু সমসাময়িক দৃষ্টিতেই ধরা পড়েছিল "চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি ধবল পর্ব্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চচূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"[১] মানুষের উপর দেবত্বের আরোপ সাধারণত ধর্মগুরুর ক্ষেত্রেই ঘটে, কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত যিনি বিদ্যাসাগরকে শিক্ষাগুরু হিসাবে দেখেছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'মহাপ্রাণ হিন্দু অবতার' বলে অভিহিত করেন।[২] রমেশচন্দ্র বা রামেন্দ্রসুন্দর জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়ে অল্পদিনের জন্য বিদ্যাসাগরকে দেখেছিলেন, কিন্তু নবীনচন্দ্র সেন নিতান্ত তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পান, আর জীবনের প্রান্তভাগে পৌঁছে তাঁর মনে হয়েছে, এক সংকট মুহূর্তে বিপদভঞ্জন হরি প্রহ্লাদের মতো তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন—"সেই নরনারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।…সেই ভগবদ্বাক্য—ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। 'পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে'—এই মহাধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার।…আজ এই উত্তাল বিপদার্ণবের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে আমি নরনারায়ণের মূর্ত্তি দেখিলাম, এ সংসারে আমিদীনহীনের আর কেহ নাই। আছেন কেবল সেই দীনবন্ধু।"[৩] বলাবাহুল্য, এই উচ্ছ্বাসময় বর্ণনার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে বাঙালির দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের যে-মূর্তি ভেসে ওঠে, তা সমসাময়িক অন্য কোনো বাঙালি মনীষী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আসলে

বিষ্ঠাসাগরের মনীষার থেকে তাঁর হৃদয়বত্তা বাঙালিকে বেশি অভিভূত এবং আকর্ষণ করেছে। বিপন্ন মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন ফ্রান্স থেকে বিষ্ঠাসাগরকে চিঠিতে লেখেন,... "I shall live to go back to India and tell my countrymen that you are not only Vidyasagara but Karuna-sagara also!" (১৮ জুন ১৮৬৪) এবং "Am I not forright in thinking that you have the heart of a Bengali mother?" (২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪)[৪] তখন থেকেই তাঁকে 'করুণাসাগর' রূপে উপস্থিত করার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। চতুর্দশপদী কবিতায় বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি যা একদা বাঙালির মুখে মুখে ফিরেছে, তারও মূল কথাটি হলো—

বিষ্ঠার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে দীনের বন্ধু ![৫]

বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে মধুসূদন কোন্ অস্ত্রশিক্ষালাভে সক্ষম হয়েছিলেন তা বলা শক্ত ("হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে / দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে / প্রণমিলা, দ্রোণগুরু !"[৬]) কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে এক বিরল ব্যতিক্রম হিসাবে বিদ্যাসাগরে মধ্যে তিনি দেখেছেন 'one of Nature's noblemen'.[৭]

মধুসূদন বা নবীনচন্দ্রের জীবনে এক বিশেষ সংকট মুহূর্তে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। তাঁরা বিদ্যাসাগরের কাছের মানুষ ছিলেন এমন বললেও অন্যায় হয় না। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র বা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিষ্ঠাসাগরপ্রশস্তি রচনা করেন তখন সেখানে ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশের প্রশ্ন ওঠে না। 'বিষ্ঠার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর'-এর পরিচয়দানকালে দীনবন্ধু 'অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়' এবং 'সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা'র কথা বললেও বেশি জোর দিয়েছেন তাঁর মানবিক পরিচয়ের উপর, যথা—'দীনজন-লালন-পালন-তৎপর, / মাতৃভক্তি

ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে যার / অদ্যাপি শিশুর মতো করে আবদার।'[৮] তবে দীনবন্ধুর অনুসরণে হেমচন্দ্র 'কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি' কিংবা 'দাতাকর্ণ দানে' বলার পর আরও কিছু বলেছেন যার মধ্যে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যথার্থ মহিমা ধরা পড়েছে—'উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দাঢ্যে শালকড়ি' এবং 'স্বাতন্ত্র্যে শেকুল-কাঁটা পারিজাত ঘ্রাণে।'[৯] বিদ্যাসাগর-প্রয়াণের পর হেমচন্দ্র যে-কবিতাটি লেখেন[১০] সেটি গতানুগতিক মহাপুরুষ-বন্দনা বা অবতার-বন্দনা ছাড়া আর কিছু নয়, কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার গানে' শুধু শ্রদ্ধাপ্রকাশ নয়, কয়েকটি রেখায় বিদ্যাসাগর-ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়—

ইংরিজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত ডিস্
টোল-স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।
এসো হে দ্বিজের চূড়া বঙ্গ অলঙ্কার!
দিক্‌পাল তোমার মত দেশে নাই আর!
দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাজায়
কার শোভাতে জলুস বেশি আসর যুড়ে যায়।[১১]

লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিধবাবিবাহ প্রচলনের কথা হেমচন্দ্র স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেন নি। অথচ উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের খ্যাতি ও অখ্যাতি প্রধানত নির্ভর করেছে সমাজ-সংস্কারে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকার উপর। দীনবন্ধু যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র তখনই তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' বিধবানারীর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন, "এত দিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে…পতিহীনা মলিনা বিধবাগণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।"[১২] কিন্তু 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক শুধু বিধবাবিবাহ আইন সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণ

করেছেন তাই নয়, তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই বিদ্যাসাগরকে কটূক্তি করেছেন ; আর এখানে ধীরাজ-কবির অশ্লীল ইঙ্গিতময় গানের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কিছু কবিতার সাদৃশ্য বড়ো দৃষ্টিকটুভাবে আধুনিক পাঠককে পীড়া দেয়—"বচন রচন করি কত কথা বলে / ধর্ম্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে / 'পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ / কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ /…অনেকেই এই মত লতেছে বিধান / 'অক্ষতযোনি'র বটে বিবাহ বিধান / কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে/একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী আছে।"[১৩] এবং "সকলেই তুমি মারে, বুঝেনাক কেউ / সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ / সাগর* যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন / তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন।"[১৪] এখানে তারকা-চিহ্নিত 'সাগর' শব্দের পাদটীকায় কবির মন্তব্য—"সাগর শব্দের টীকা পাঠকেরা করিবেন।"

"বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব এবং কৃতিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিদ্যাসাগর প্রকৃতপক্ষে বড় লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর দানে বড় ; বিদ্যাসাগর পরদুঃখকাতরতায় বড় ; বিদ্যাসাগর বুদ্ধিবলে বড় ; তিনি আরও কত শত বিষয়ে সাধারণ লোক হইতে অনেক বড়।"[১৫]—বিদ্যাসাগরের অন্যতম চরিতকার বিহারীলাল সরকারের এই মন্তব্যের সঙ্গে সেকালের অধিকাংশ বাঙালি একমত ছিলেন। কিন্তু বিধবাবিবাহ আইন প্রবর্ত্তনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগ ঈশ্বর গুপ্তের মতো বিহারীলালেরও ভালো লাগে নি, এখানে তিনি সাধারণ বাঙালি সমাজের প্রবক্তা বললে ভুল হয় না। (মহাপুরুষ, এমনকি অবতারেরও ভ্রান্তি নিয়ে সেকালে বাঙালি অনেক গবেষণা করেছে)। আসলে বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দশ বছর তাঁকে যে অজস্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, তার পিছনে একটি বড় কারণ ছিল নবোত্থিত জাতীয় ধর্মোন্মাদনা, যাকে আমরা সাধারণত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলন বলে থাকি। বিদ্যাসাগরের জীবনী রচনাকালে বিহারীলাল তাঁর গ্রন্থের নাম দেন 'বিদ্যাসাগর, অর্থাৎ সমালোচনা-সংবলিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-

সাগরের জীবনী'। এখানে সমালোচনার অর্থ 'দোষের সম্যক্ সমালোচনা', এবং দোষ বলতে বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার প্রয়াস—"কারুণ্য-প্রাবল্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আত্মসংযমে সক্ষম হন নাই। তাই তিনি ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে এই অকীর্ত্তিকর কার্য্যে [বিধবাবিবাহ] হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।"[১৬] আইন সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয় নি তার কারণ 'অহিন্দু' আচার কখনও হিন্দুসমাজে গৃহীত হতে পারে না (পরবর্তী কালে চন্দ্রনাথ বসু[১৭], অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১৮], ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়[১৯] সকলেই মোটের উপর এই মত পোষণ করেছেন)। জীবনসায়াহ্নে সহবাস-সম্মতি আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের অভিমতকে তাই অনেকের মনে হয়েছিল "[বিধবা-বিবাহ] বিচারে যে ভ্রম হইয়াছিল, সম্মতি-আইনের বিচারে সে ভ্রম ঘটে নাই।"[২০] অন্যদিকে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি 'আমরণ ভক্তিভরে তাঁহার [বিদ্যাসাগরের] পূজা' করেছেন এবং 'সেই পূজার আয়োজনেই' তাঁর বিদ্যাসাগর-চরিত রচনার প্রয়াস, তিনি সহবাসসম্মতি আইন সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "ঐ আইন সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণ সহানুভূতির অভাব এবং পরিবর্ত্তিত আকারে ঐ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, যখন তখন, যেমন তেমন পরিবর্ত্তনের প্রার্থী হইয়া কখনও সংস্কার-ক্ষেত্রে কিংবা রাজদ্বারে উপস্থিত হন নাই। সুযুক্তি ও সমাজ-ধর্ম্মের সীমার মধ্যে থাকিয়া যতদূর পরিবর্ত্তন সম্ভব, তিনি স্বদেশবাসিগণের ততদূর মঙ্গলসাধনেই আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন।"[২১] সেইসঙ্গে তিনি আরও বললেন, বিদ্যাসাগর যে আজীবন সমাজধর্মের সীমার মধ্যে অবস্থান করেছেন—"সম্মতি-আইন সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুভাব ও হিন্দুসংস্কারের রক্ষাকল্পে তিনি অপর কোন আস্থাবান হিন্দু অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কেহ কেহ দয়া করিয়া তাঁহাকে ভ্রান্ত হিন্দু বলিয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা জাতীয় অপদার্থতা ও অধোগতির আর কি অধিক পরিচয় হইতে পারে?… আমাদের পোড়া কপাল যে, এরূপ মহাত্মা লোকের আবির্ভাব ও কার্য্যকলাপ ভাল

করিয়া উপলব্ধি করিতে এবং সে সকলের উপযুক্ত মূল্য নির্দেশ করিতে পারিতেছি না। তিনি আহারে ব্যবহারে চিরদিন সম্পূর্ণ হিন্দুভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন ; কখনও ভ্রমক্রমেও অখাদ্য ও অপেয় গ্রহণ করেন নাই।"[২২] বিহারীলাল যাঁকে বলেন 'দয়ার অপূর্ব্ব অবতার'[২৩], চণ্ডীচরণ তাঁকেই বলেন 'লোকহিতৈষণা ও জীবে দয়া'র[২৪] অ-তুলনীয় নিদর্শন। দুজনেই সমসাময়িক 'হিন্দু আদর্শে'র মানদণ্ডে বিদ্যাসাগরকে বিচার করেছেন, এবং তথাকথিত নিন্দা ও প্রশংসার পিছনে উনিশ শতকীয় বাঙালি মনোভাবই কাজ করেছে।

২.

বিদ্যাসাগরকে যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা মহাপুরুষের দেহরূপের বর্ণনায় কিছুটা অস্বস্তিবোধ করেছেন। বিদ্যাসাগর সুপুরুষ ছিলেন না। নিজের চেহারা নিয়ে তিনি নিজেই বিদ্রূপ করতেন। তবে সব মিলিয়ে ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল না। নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায়, "এই খর্ব্বাকৃতি চক্রাকারে মুণ্ডিতমস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ণ নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনল-সংযুক্ত একটি সামান্য হুঁকা, মুখে হাসি, মূর্ত্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্য্যন্ত সমানভাবে চির-পরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যা-সাগর?"[২৫] বালক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য প্রথম সাক্ষাৎ দর্শনে মনে হয় আত্মীয়বৎ সস্নেহ আলাপের সুযোগ পান নি,—"তিনি [রামসর্বস্ব পণ্ডিতমহাশয়] একদিন আমার ম্যাকবেথের তর্জমা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শুনাইতে হইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। তখন তাঁহার কাছে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [বন্দ্যোপাধ্যায়?] বসিয়া ছিলেন। পুস্তকে-ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে

আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল, তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহসবৃদ্ধি হইল তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব, এখান হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।"[২৬] বালক অমৃতলাল বসু এদিক থেকে আরও সৌভাগ্যবান, কাশীতে অবস্থানকালে—"সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—'গল্প বলিতে হইবে।' তিনি বলিলেন—'গল্প শুন্‌বি? কি রকম গল্প বল্‌ব,—দু মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—'ওরে চুড়ি কিনতে হবে।' এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—'পেতেই হবে; কাশীতে এসে চুড়ি না নিয়ে ফিরে যাব কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ি কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশর আবার গল্প বলিতে লাগিলেন।"[২৭]

বিদ্যাসাগর খুব ভালো গল্প বলতে পারতেন, তার বর্ণনা-বিবরণ আরও অনেকের স্মৃতিকথার মধ্যে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে পরিহাসরসিকতার দিকেও তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়া জানেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে তাঁহার কথাবার্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল।"[২৮] অবশ্য সেকালের হাসি-তামাসা অধিকাংশ সময়ে আধুনিক রুচিতে আপত্তিকর ঠেকবে ('আবার অতি অল্প হইল' নামে বেনামী পুস্তিকার রসিকতার নমুনা—"খুড় অনেক আহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছেন, যথার্থ বটে; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যা নিরতিশয় গুরুপাক দ্রব্য, হজম করিতে পারেন নাই; সুতরাং, অপচার ও উদরাধ্মান হইয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে যে নিঃসরণ হইতেছে, তাহার সৌরভে সমস্ত দেশ আমোদিত করিতেছে।") কৃষ্ণকমলও তা জানতেন, তাই

কিছুটা ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে লেখেন—"অত কথায় কাজ কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচিবিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়িতে ডাকাইয়া বলিতেন, 'ধীরাজ, একবার গানটা গাও ত। সেই যে বিদ্যাসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে'; ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত,…গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য।"[২৯]

রামকৃষ্ণ পরমহংস বয়সে বিদ্যাসাগরের থেকে অনেক ছোট ছিলেন, কিন্তু কথামৃত পড়লে সেখানেও অনুরূপ হাসি-তামাসার সন্ধান মেলে যা 'এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য' (কথামৃতের বিভিন্ন সংস্করণে তথাকথিত গ্রাম্য ও অশ্লীল শব্দের বর্জন বা রূপান্তর সম্ভবত আধুনিক রুচির নির্দেশেই করা হয়েছে, যদিও এর ফলে 'শ্রীম নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বসিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছিলেন' সেই প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণজাত উপকরণ অবিকৃত থাকে নি)। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকারের যে-বিবরণ কথামৃতে পাওয়া যায় (৫ আগস্ট ১৮৮২) তা থেকে মনে হয় সমসাময়িককালের এই দুই মহাপুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু কথামৃতের বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ যখনই এসেছে, তখনই দেখা গেছে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ অত্যন্ত কঠোর এবং তিক্ত মন্তব্য করেছেন। যথা—

"বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাকে চিনেছি, কতদূর তার বুদ্ধির দৌড়! যখন বললুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর বললে, মহাশয়, তবে কি তিনি কারুকে বেশি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি অমনি বললুম, তা দিয়েছেন বইকি। শক্তি কম বেশি না হলে তোমার নাম এত হবে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এইসব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই! বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম, কিন্তু কাঁচা কথা বলে ফেললে, তিনি কি

কারুকে বেশি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? কি জানো, জালে প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে; রুই কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়, তখন চুনো পুঁটি,, পাঁকাল এইসব মাছ বেরোয়, একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বর না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনোপুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হলে কি হবে?"৩০ (১৫ জুন ১৮৮৩)

"বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য আছে, দয়া আছে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নাই। অন্তরে সোনা চাপা আছে, যদি সেই সোনার সন্ধান পেত, এত বাহিরের কাজ যা কচ্চে সে সব কম পড়ে যেত; শেষে একেবারে ত্যাগ হয়ে যেত। অন্তরে হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর আছেন, এ কথা জানতে পারলে তাঁরই ধ্যান চিন্তায় মন যেত। কারু কারু নিষ্কাম কর্ম অনেক দিন করতে করতে শেষে বৈরাগ্য হয়, আর ঐদিকে মন যায়; ঈশ্বরে মন লিপ্ত হয়।"৩১ (২২ জুলাই ১৮৮৩)

"বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন? 'সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুট জবান।' সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে কিন্তু এলো না।"

"পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাৎ। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক, আর করে এক।"৩২ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)

"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।"৩৩ (২৩ মে ১৮৮৫)

বিদ্যাসাগরের বুদ্ধির দৌড় রামকৃষ্ণ ধরে ফেলেছিলেন, আরও জেনেছিলেন লোকটা পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি নেই, সাধনা নেই, অন্য পণ্ডিতদের মতো

কামিনী-কাঞ্চনে মন, তার উপর সত্য কথা বলে না। বিদ্যাসাগরের 'পাণ্ডিত্য' বা 'অনেক পড়া আছে'—একথা রামকৃষ্ণ বারবার বললেও, স্পষ্টই বোঝা যায় এ সম্বন্ধে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। যাঁরা বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্যের কথা জানতেন, যেমন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁরাও সে দিকটি নিয়ে বেশি আলোচনা করেন নি। হরপ্রসাদ তাঁর স্মৃতিকথায় সমাজসংস্কারক ও শিক্ষা-সংস্কারক বিদ্যাসাগরের কথা বলেছেন, এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন "তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন…সাংসারিক কাজে বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির আর একটি উদাহরণ দিব [হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড]।"[৩৪] বিদ্যাসাগরের ব্যবহারিক বুদ্ধির অভাব ছিল না সত্য, কিন্তু কোনো সংগঠন বা সংস্থায় অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পিতার চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের কতগুলি সাদৃশ্য দেখেছিলেন, যথা—'স্বমতপ্রিয়তা', 'ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব', 'আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসাভাব'।[৩৫] চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ডের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কচ্যুতি বিষয়ে লেখেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যক্তিগত কলহের অধীন হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠিত বৃত্তিভাণ্ডারের সহিত সকল সম্বন্ধচ্ছেদ করিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহার মত লোকের নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করা স্বাভাবিক। তিনি আবার অত্যধিক মাত্রায় নিজের সঙ্কল্পের অধীন হইয়া চলিতেন।…দশজনের মিলিত কাজে তাঁহার অধিক বিশ্বাস ছিল না, তাই একাকীই অনেক কাজ করিতেন এবং যাহা করিতেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতেন।"[৩৬] বলাবাহুল্য, দশজনের সঙ্গে তিনি কাজ করতে পারতেন না বলেই 'ভারতসভা' স্থাপনকালে শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু তাঁকে সভাপতি-পদ গ্রহণের প্রস্তাব করলে তিনি অসম্মতি জানালেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন 'সারস্বত সমাজ' গঠনের পরিকল্পনা করেন তখন "সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি [বিদ্যাসাগর] বলিলেন, 'আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—হোমরা-

চোমরাদের লইয়া কোনো কাজ হইবে না, কাহারও সঙ্গে কাহারও মতে মিলিবে না।' এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজি হইলেন না।"[৩৭] অবশ্য সাধারণভাবে বিদ্যাসাগর সভাসমিতি পরিহার করতেন; শুধু বক্তৃতা দিতে পারতেন না তাই নয়, সংস্কৃত কলেজে বা মেট্রোপলিটান কলেজে তিনি কোনোদিন নিয়মিত ক্লাসে পড়িয়েছেন এমন জানা যায় না।

কিন্তু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য যিনি সংগত কারণেই দাবি করতে পারেন, "বিদ্যাসাগরকে আমি যত ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তেমন আর কেহ জানে না, ইহা আমি স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি"[৩৮], তিনি যখন বলেন "সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি [বিদ্যাসাগর] তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"[৩৯] কিংবা "বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাঁহার narrowness, তাঁহার bygotry, তাঁহার 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না।"[৪০] তখন বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। আর শুধু সাহিত্যবোধ নয়, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কোথাও অসহনশীলতার ভাব কাজ করেছে, তাই তীব্র আক্রমণ ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কৃষ্ণকমলকে কিছুটা জোর দিয়ে বারবার বলতে হয় "আমি মনে মনে জানি আমি তাঁহার একান্ত ভক্ত, এবং তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব ও ঔদার্য সর্ব্বাঙ্গীন বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয়ত দুই একবার তোমাকে বলিয়াছি He could not bear a brother near the throne। কিন্তু এই সামান্য দুর্বলতাটুকু বিস্তর বড়লোকের চরিত্রে দেখা যায়।"[৪১]

বিদ্যাসাগরকে সে কালে যেমন 'অবতার' হিসাবে সকল দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে স্থাপন করার চেষ্টা দেখা গেছে, তেমনি 'সামান্য দুর্বলতা' নির্দেশের মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট করার প্রয়াসও ঘটেছে। সমসাময়িকের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের পরিচয় গ্রহণকালে দুটি দিক সম্বন্ধেই সচেতন থাকা প্রয়োজন।

চারণ, পৌষ ১৩৯৬।

---

১. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৩০৩), রামেন্দ্রসুন্দর রচনা-সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, গ্রন্থমেলা, ১৯৭৫, পৃ. ১৮৪

২. রমেশচন্দ্র দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১২৯৮), রমেশ-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ১৯৭৫, পৃ. ২৩৪

৩. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, প্রথম ভাগ (১৯০৮), নবীনচন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮১, পৃ. ২০২, ২০৪

৪. দ্র. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধু-স্মৃতি, কলিকাতা, এস. সি. সান্যাল অ্যাণ্ড কোং, ১৩২০, পৃ. ১১৬, ১৮২

৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫, পৃ. ১৭৯

৬. বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উপলক্ষে, মধুসূদন রচনাবলী, পৃ. ১৬৯

৭. মধু-স্মৃতি, পৃ. ৪৫৮

৮. দীনবন্ধু মিত্র, সুরধুনী কাব্য, দীনবন্ধু রচনাবলী, কলিকাতা, শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৭, পৃ. ৩৮১

৯. দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৩০, পৃ. ৪৯

১০. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, হিতবাদী কার্যালয়, ১৩১১, পৃ. ৩৬৫-৬৬

১১. দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১

১২. দীনবন্ধু মিত্র, বিধবার বিবাহ, দীনবন্ধু রচনাবলী, পৃ ৪২৭

১৩. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিধবাবিবাহ, গ্রন্থাবলী (মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত), কলিকাতা, মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৩০৮, পৃ. ১৬৭

১৪. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিধবাবিবাহ আইন, গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৬৯

১৫. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, কলিকাতা, মেডিকেল লাইব্রেরী, ১৩০৭, পৃ. ৫৮৪

১৬. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৬৪

১৭. দ্র. চন্দ্রনাথ বসু, হিন্দুবিবাহ, কলিকাতা, ১২৯৪

১৮. দ্র. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হিন্দু বিধবার আবার বিবাহ হওয়া উচিত কিনা, অক্ষয় সাহিত্যসম্ভার, [প্রথম খণ্ড] কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৬৯

১৯. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধবার পুরুষান্তর গ্রহণ, ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, বঙ্গবাসী, ১৩৩২

২০. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, পৃ. ৫৬৬

আধুনিককালে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে, এবং বিহারীলাল সরকারের ভ্রান্তিপ্রদর্শনকালে ('বিহারীলালের এ ধারণা ভুল।') অনেক বাক্যব্যয়ের পরও বিনয় ঘোষকে লিখতে হয়েছে—"বোঝা যায় না, কেন এই পত্রের মধ্যে তিনি [বিদ্যাসাগর] 'religious usage' কথাটির উপর এত জোর দিয়েছিলেন! বোঝা যায় না, শাস্ত্রসম্মত ধর্মাচারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে বলে কেন তিনি এত চিন্তিত হয়েছিলেন! যিনি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক এবং বহুবিবাহের ঘোর বিরোধী, তিনি কেন 'বাল্যবিবাহপ্রথা' আইনের দ্বারা নির্মূল করতে চাইলেন না? এ কি তাঁর বার্ধক্যের দুর্বলতা ও মানসিক দ্বন্দ্ব? অথবা কার্যক্ষেত্রে তাঁর সংস্কারকর্মের অন্তর্বিরোধের পরোক্ষ স্বীকৃতি?...তাঁর মতো পুরুষের জীবনে এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো সর্বতোভাবে কাম্য ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি স্বশ্রেণীগত

স্ববিরোধের জালে জড়িয়ে পড়ে সেই প্রত্যাশাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করতে অক্ষম হয়েছিলেন।"—বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, কলিকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭৩, পৃ. ৪৪১

২১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯১৪, পৃ. ৩৪৫

২২. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩৪৫-৪৬

বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাসাগর-জীবনী সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞ সমালোচকের তুলনামূলক বিচার কিছুটা বিভ্রান্তিকর মনে হয়—"চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর নয়।...কাজেই দেখা যাচ্ছে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ায় বিদ্যা-সাগরের জীবনী রচনায় অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল এবং বিহারীলাল আপেক্ষিক রক্ষণশীল দৃষ্টির পরিচয় রেখে গেছেন।"—দেবীপদ ভট্টাচার্য, বাংলা চরিত সাহিত্য, কলিকাতা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৪, পৃ. ১৯৭, ১৯৯

২৩. বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, পৃ. ৩

২৪. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পৃ. ৫৬৩

২৫. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, প্রথম ভাগ, নবীনচন্দ্র গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০৩

২৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ. ৬২

২৭. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, বিদ্যাভারতী, ১৩৭৩, পৃ. ২০৭

২৮. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ১২৩

২৯. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৫২

৩০. শ্রীম-কথিত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, কথামৃত ভবন, ১৩৮১, পৃ. ৬৪

৩১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথমভাগ, পৃ. ৮৯

৩২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ৬৫-৬৬

৩৩. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পৃ. ১৭৪

৩৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ, কলিকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৩৮, 'ভূমিকা' অংশ, পৃ. ১-২৬

৩৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯, পৃ. ২৬৫

৩৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, পৃ. ৫০৪-৫০৫

৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৭

৩৮. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৩১৩

৩৯. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৩০

"শ্যামাচরণবাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণবাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না।" "বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে [কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়] মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন, লোকটার রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।"

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখ্তে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা' সংস্কৃতশাস্ত্রে। ইহাতে সাহেবেরা মনে ভাবেন—বাস্ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে'।" পৃ. ৩০-৩১

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না।...তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না।...বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না।"
"যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাষ্পাকুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গ-হস্ত।" পৃ. ৪৫-৪৬

৪০. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৪৬

৪১. পুরাতন প্রসঙ্গ, পৃ. ৭৬

৪

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও উনিশ শতকের বাঙালি-সমাজ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একদা যে ধারণা পোষণ করেছি, সম্প্রতি 'ভূদেব-চরিত' এবং ভূদেবের রচনাবলী আর একবার পড়বার পর মনে হচ্ছে তা কিছুটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে[১]। ভূদেবকে একসময়ে মনে হয়েছিল উনিশ শতকে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে এক বিরল ব্যতিক্রম, যাঁর মধ্যে আপস-রফা নেই বললেই চলে, যুগের স্ববিরোধ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এমনই এক আত্মস্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। কিন্তু ভূদেব অসাধারণ ভাগ্যবান পুরুষ হলেও নিজের যুগকালকে অতিক্রম করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় নি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে আমরা যখন ভাগ্যবান পুরুষ বলি, তখন তাঁর বন্ধু-ভাগ্যের কথা মনে পড়ে (মাইকেল মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর সহপাঠীবন্ধু[২]), কর্মজীবনে তাঁর মনিব-ভাগ্য অসামান্য (হজ্‌সন্‌ প্র্যাট, জে. জি. মেডলিকট, অ্যাশলি ইডেন প্রভৃতি সাহেবেরা সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন[৩]) আর পুত্র-পরিজন-ভাগ্য (গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেবের মতো আদর্শ-পুত্র) একালে প্রায় রূপকথার মতো কল্পনার বস্তু, এমনকি তাঁর জীবনী-ভাগ্যও কমজনের কপালেই জোটে (দিনপঞ্জি ও পত্রের সদ্ব্যবহার করে তিনখণ্ডে পূর্ণাঙ্গ জীবনী[৪])। ভূদেবের বিশ্বাস ছিল প্রত্যাশাঅনুসারে প্রাপ্তিলাভ ঘটে, এবং এই প্রত্যাশার পিছনে আছে যথোচিতভাবে দেহ, মন ও চরিত্রগঠন। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান; কর্মজীবন শুরু হয়েছিল কলিকাতা মাদ্রাসায় পঞ্চাশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে; কর্ম-জীবনের শেষে সরকারি শিক্ষাবিভাগে প্রথম শ্রেণীতে পদোন্নতি, সি-আই-ই উপাধিলাভ, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। অবশ্যই উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত বাঙালির সাফল্যের ইতিহাস হিসাবে ভূদেব-চরিতকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

হিন্দু কলেজে একদিন মাসিক পাঁচ টাকা মাইনে দেওয়াও ভূদেবের পিতার পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, সেই ভূদেব পরিণত বয়সে তিন লক্ষ টাকার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হন। প্রচণ্ড পরিশ্রম, ত্যাগস্বীকার, অর্থচিন্তা, সঞ্চয়বুদ্ধি,—এই সাফল্যের কারণ। পরিণামে চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য দেড় লক্ষ টাকা দান ব্যক্তিগত আদর্শবাদের চরম দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই জীবন তো বিষয়ী মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবন। এর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-আদর্শের ধারক-বাহক, রঘুনাথ-রঘুনন্দন ধারার শেষ পণ্ডিত, হরিনারায়ণ সার্বভৌমের পৌত্র, বিশ্বনাথ তর্কভূষণের পুত্রের জীবনকে ঠিক মেলানো যায় না।

ব্রাহ্মণসন্তান হিসাবে ভূদেব বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অধ্যাপন-অধ্যয়ন-যজন-যাজন-দান-প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি ব্রাহ্মণের কার্য ; এর মধ্যে তিনটি ব্রাহ্মণের জীবিকা—যাজন, অধ্যাপন এবং সৎপ্রতিগ্রহ। ভূদেবও তাঁর জীবন শুরু করেছিলেন পিতার আদর্শে যাজন এবং অধ্যাপনবৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু অনতিপরে অর্থের প্রয়োজনে এবং সামাজিক কারণে তাঁকে বেতনক্রীত রাজকর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে।[৫] শুধু তাই নয়, সুদে টাকা খাটানো অর্থাৎ কুসীদগ্রহণেও তাঁর আপত্তি ছিল না।[৬] এমনকি কোনো সময়ে জমিদারি-ক্রয় এবং সংরক্ষণেও তাঁর আগ্রহ দেখা গেছে।[৭] অন্যদিকে তাঁর দুই পুত্র 'আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন' হয়েও আজীবন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করেছেন—তাতে ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো বাধা জন্মায় নি। ইংরেজ-রাজত্বে সম্ভবত ব্রাহ্মণকেও কয়েকটি ক্ষেত্রে আপৎকাল বিবেচনায় নতুনভাবে 'ধর্ম' ব্যাখ্যা করতে হয়েছে, এবং প্রত্যাশাপ্রাপ্তির সংগতিসাধনে নতুনভাবে সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তির জীবনে আদর্শ অনুসন্ধান করতে হয়েছে।

উনিশ শতকে কলিকাতা শহরের প্রচলিত জীবনধারার সঙ্গে ভূদেবের একটা বিরোধ আছে। নিতান্ত বালক-বয়সে একবার সাময়িক চিত্তবিভ্রম ঘটলেও, খুব শীঘ্রই তিনি পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেয়েছেন। পিতার কাছ থেকে তিনি লাভ

করেছেন হিন্দু-ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তি, যা প্রায় অনড় অটল ভাবে সারা জীবন রক্ষা করেছেন। পরিণত বয়সে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ অব্যর্থ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন—

"সনাতনধর্ম্মের মাহাত্ম্যের জন্যই হিন্দু উহাকে ধরিয়া রহিয়াছেন এবং 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ' কথাটি হিন্দু শুধু মুখে বলেন নাই, সহস্র নির্য্যাতনের মধ্যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কাজেও করিয়া আসিয়াছেন। তাই সনাতনধর্ম্ম, হিন্দুকে ধারণ বা রক্ষণ করিতেছেন (ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ)। মিশর, পারস্য, ব্যাবিলন, ক্যালডিয়া, অ্যাসিরিয়া, গ্রীস, রোম, মেক্সিকো, ব্রিটেন প্রভৃতির প্রাচীন জাতীয় ধর্ম্ম এবং তথাকার প্রাচীন জাতির সন্তানেরা আজ কোথায়? পরধর্ম্মের এবং পরজাতির সহিত সংঘর্ষ হইবামাত্রই উহাদের লোপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই ভারতবাসীর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম অজর, অমর ও অখণ্ড কেন? উহাই যে সম্পূর্ণ সত্যধর্ম্ম; উহাই যে সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর সর্ব্বপ্রকার সাধনার জন্য উন্মুক্ত পরমকারুণিক বিরাট সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম।

"এই পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুই প্রকৃতপক্ষে পরধর্ম্মের এবং পরজাতির বিদ্বেষ করেন না। তাঁহার চোখে 'বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ং' সকল ঈশ্বর-পরায়ণ ভাললোককেই তিনি বন্ধু মনে করেন—যে সম্প্রদায়ভুক্তই তিনি হউন না এবং যে দেশবাসীই হউন না—হিন্দু যে শ্রীভগবানের শ্রীমুখেই শুনিয়াছেন 'মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।' হিন্দুর আর বিদ্বেষের স্থান কোথায়? এই সর্ব্বব্যাপী হিন্দুত্বকে গ্রাস করিবে কে? ফলতঃ হিন্দুর উদারতম শাস্ত্রসংসর্গে অপর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই উচ্চ সাধকদিগের মধ্যে সাত্ত্বিক হিন্দুভাব অল্পবিস্তর প্রবেশ করিয়াছে এবং করিতেছে। সাত্ত্বিক হিন্দু, সে বাহাদুরীটুকুর দাবীও করেন না। খ্রীষ্টান মিষ্টিক সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের গুপ্ত যোগসাধন, হিন্দুর নিকটই প্রাপ্ত বলিয়া কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, তাহাতে হিন্দুর কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। থিয়সফির ক্রমশঃ সর্ব্বদেশ বিস্তারে 'ভেজাল হিন্দুত্বেরও' রসাস্বাদে যে

অপর জাতীয়দিগের অনেকটা আনন্দলাভ হয়, ইহাই সূচিত করিতেছে! কেহ তাহা স্বীকার না করুন, তাহাতে কোন ক্ষতিই নাই। 'সর্ব্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু— সকলেই স্ব স্ব মঙ্গলের পথ দেখিতে পাউন'—হিন্দুর এই মাত্র প্রার্থনা।"[৮]

বলা বাহুল্য ভূদেবের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু ভূদেবের সাহিত্যজীবন এই 'সাত্ত্বিক হিন্দুভাবে'র উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই তাঁর 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' আলোচনা-কালে তো বটেই, এমনকি 'পুষ্পাঞ্জলি', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' পাঠকালেও আমাদের ভূদেবের ব্যক্তিগত জীবনের ধ্যানধারণার কথা মনে রাখতে হবে। অন্যদিকে ভূদেবের এই ধ্যানধারণা একেবারেই তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করার কোনো কারণ নেই—উনিশ শতকে তথাকথিত রেনেসাঁসের পরিণতি যে ধর্মান্দোলনে, তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, ধর্মসভা থেকে ব্রাহ্মসভা, ভবানীচরণ থেকে দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও শশধর তর্কচূড়ামণি যে-প্রবাহ রচনা করেছেন ভূদেব তা থেকে বিচ্ছিন্ন নন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় কাছাকাছি সময়ের মানুষ, কিন্তু দুজনের মধ্যে যেন যোজন-দূরত্ব। বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের কালেও সকলের থেকে স্বতন্ত্র—তাঁর সমাজচিন্তা, শিক্ষাচিন্তা, ধর্মচিন্তা কোনো কিছুর সঙ্গেই সে কালের সাধারণ বাঙালির মানসসাযুজ্য ঘটে নি। হয়তো সেখানেই তাঁর ব্যর্থতা, যদি তাকে ব্যর্থতা বলি—তাঁর অধিকাংশ আন্দোলন যতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ততটা ফল-প্রসূ হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি অনেকটা নিঃসঙ্গ নৈরাশ্যবাদী এমনকি নাস্তিক হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে ভূদেব শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, তাঁর বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাসংস্কারে বা চতুষ্পাঠীস্থাপনে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মপ্রচারে বা সামাজিক আদর্শস্থাপনে সফল পুরুষ। বিধবাবিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধে ভূদেবের প্রবল আপত্তিবোধ ছিল, কারণ "বিধবাবিবাহ প্রবৃত্তিমার্গের অনুকূল এবং হিন্দু যে ভাবে ক্রমশঃ বৈবাহিক ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিপরীত ব্যবস্থা বলিয়া ঐ চেষ্টা,

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে 'চাঁদে কলঙ্ক' বলিয়াই আমি মনে করি।"[৯] শুধু তাই নয়, ভূদেবের মতে, "তিনি যে সামাজিক সংস্কার বিষয়ে রাজব্যবস্থার অনুকূল ছিলেন সেটি[ও] দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় তাঁহার বুঝিবার ভুল।"[৯] আর বিদ্যাসাগরের বালকপাঠ্যগ্রন্থ "চরিতাবলীর ন্যায় পাঠ্যপুস্তকে সুকুমারমতি বালকেরা বড়লোকের চরিত্র পাঠ করিতে গিয়া কেবল বৈদেশিকের নাম দেখে, বিজাতীয় আচারের কথায় স্তম্ভিত হয় এবং তাদের স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বড় লোক বা ভাল লোক বা অধ্যবসায়শালী লোক কেহ কখন হয় নাই এইরূপ মনে করিতে শিখে এবং জাতীয় মর্য্যাদাবোধশূন্য হইয়া পড়ে"[৯]—এও ভূদেবের কাছে আপত্তিকর মনে হয়। তাই তিনি বলতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ভদ্রঘরে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন চেষ্টা এবং স্কুলপাঠ্য গ্রন্থে এদেশীয় বালকদিগের নিকট শুধু বিদেশীয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শ ভাবে দেখান, স্ব সমাজের ক্ষতিকর এই দুইটি কার্য্য স্থায়ী হইবে না; অল্পকাল মধ্যেই ঐরূপ বিধবাবিবাহ ও ঐরূপ কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক অপ্রচলিত-প্রায় হইয়া লোকের স্মরণ পথের অতীত হইয়া যাইবে।"[৯]

অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও ভূদেবের মানসিক সাধর্ম্য ঘটা সম্ভব ছিল না। ভূদেবের আদর্শবাদ মুখ্যত ধর্মীয় অনুশাসন ও উপলব্ধিনির্ভর। বঙ্কিমের আদর্শবাদ প্রীতিতত্ত্ব ও অনুশীলননির্ভর। ভূদেব জাতীয়ভাব বৃদ্ধির জন্য সাম্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, যদিও জাতিভেদপ্রথা রক্ষায় তিনি দৃঢ়সংকল্প। বঙ্কিম শুধু সাম্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন নি, তিনি অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণ ও অসাম্য দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করেছেন। ভূদেব হিন্দুমুসলমান এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য কল্পনা করেছেন (যদিও হিন্দুরাজত্বের স্বপ্ন এবং ব্রাহ্মণাধিপত্যের কথা কখনো ভোলেন নি), বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এই জাতীয় ঐক্য-কল্পনাকে ততখানি প্রশ্রয় দেয় নি। ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানীদের রচনায় সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্বন্ধে যে-ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, ভূদেব তা গ্রহণ করেন নি; বঙ্কিম অন্তত 'বাহুবল ও বাক্যবল' এবং 'সাম্য' প্রবন্ধে তা

অনেকাংশে মেনেছেন। ভূদেব বঙ্কিমের 'সাম্য' পড়ে স্পষ্টই উত্তেজিত হয়ে লেখেন "জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুইটি পাতাও পরস্পর সমান হয় না।...জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই।...প্রাকৃতিক সাম্যবাদে মৌলিক তথ্য নিহিত এবং ভাবিক সাম্যবাদে মৌলিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ বলেন, সকলই মূলতঃ এক, কর্ম্মভেদে পৃথগ্‌ভূত। ভাবিক সাম্যবাদ প্রত্যক্ষের অপনয়ন করিয়া বলেন, সকলেই জন্মতঃ সমান, সামাজিক ব্যবস্থাদির দোষে পৃথক্‌কৃত। এইজন্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সমাজের মধ্যে অপ্রকৃত এবং অশান্তিকর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না। ...সমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটি লোকের গুণানুসারিণী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে।" ("সামাজিক প্রবন্ধ")। বঙ্কিমের মধ্যে আত্মবিরোধ আছে, পরিণত বয়সে তিনি নিজে 'সাম্য' বইয়ের প্রচার রহিত করেছেন। তবু বঙ্কিমের 'প্রীতিতত্ত্বে'র মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনদর্শন প্রত্যক্ষ করা যায়। আসলে বঙ্কিমের প্রেক্ষিত শুধু আধুনিক নয়, তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'প্রচার'-পর্বের বঙ্কিমকেও তাই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান-আন্দোলনের সঙ্গে ঠিক মেলানো যায় না। শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে তাই বঙ্কিম বলেন, "কয় দিন তাঁর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। ওরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতকগুলি অসার লোক নাচিয়া 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করিতে পারে, কিন্তু ওতে কোনও স্থায়ী ফল হইতে পারে না। মালা, তিলক, ফোঁটা ও শিখা রাখায় যে ধর্ম্ম টেঁকে, আর ঐগুলির অভাবে যে ধর্ম্ম লোপ পায়, সে ধর্ম্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যস্ত নহে। তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়। কি হইলে এদেশের সমাজধর্ম্ম এখন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়, সে জ্ঞানই এঁদের নাই, তাই যা খুসী তাই বলিয়া লোকের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।"[১০] আর এই একই সময়ে শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে ভূদেব উচ্ছ্বসিত হয়ে লেখেন, "শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রকৃত ভাললোক। তিনি উৎকৃষ্ট বক্তা এবং

বঙ্গভাষায় উত্তম লিখিতে পারেন। তাঁহার ভাষায় ভাবের বিপর্য্যয় হয় না এবং অবান্তর কথা সহজে আসিয়া পড়ে না। তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; কিন্তু তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেওয়া হয় নাই!"[১১]

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সমাজচিন্তার পরিচয় গ্রহণকালে বিশেষভাবে তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের আলোচনা করা যেতে পারে। 'গ্রন্থের আভাস' অংশে ভূদেব জানিয়েছেন, "এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্ত্তব্যসূত্র অনির্দ্দিষ্ট, এবং কার্য্যকলাপ অব্যবস্থিত হইয়া পড়িতেছে।" এ অবস্থায় আমাদের 'কর্ত্তব্য অবধারণে'র জন্য ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধ' লেখেন। উনিশ শতকের শেষ পাদে ভূদেব যখন 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় এই প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন তখন বাঙালির মনে স্বাজাত্যবোধ এবং হিন্দুধর্মমহিমা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ভূদেবের মূল প্রতিপাদ্য—জাতীয়ভাব বৃদ্ধি এবং জাতির ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্ণয়। সমকালের জাতীয়তাবোধকে পরোক্ষ-ভাবে জাগাতে সাহায্য করবে—'সামাজিক প্রবন্ধ' পড়ে এমন আশঙ্কাও কারো কারো মনে জেগেছিল।[১২] কিন্তু উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনের অবসান কেউ চান নি। ইংরেজ শাসনের সুবিধাটুকু ভোগ করতে চাই, কিন্তু অতীত ঐতিহ্য স্মরণে আত্মশ্লাঘার প্রকাশও অনিবার্য। সুতরাং 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থে কোথাও 'গবর্ণমেণ্টের বিরোধীকথা' প্রাধান্য পায় নি, বরং ভূদেব একাধিক স্থানে স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন, "আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না। আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন।" "আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহুকালের জন্য চাহি না।" "ভারতবর্ষে একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব, অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি-

করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য জাতীয়ভাব এবং রাজভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ভূদেবের চোখে পড়ে নি।

ভূদেব আদর্শ হিন্দুসমাজের কথা বর্ণনা করেছেন। বর্তমানে সেই হিন্দু-সমাজের অবশিষ্ট বিশেষ কিছুই নেই, উনিশ শতকেও ছিল বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভূদেবের আদর্শ এক 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষ'-কে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে, কিছু পরিমাণে হিন্দুভারতবর্ষের চিত্র, কিন্তু অনেকখানিই তাঁর কল্পনার সামগ্রী। অতীত তাঁর কাছে জীবন্ত, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী, শুধু বর্তমানকে নিয়েই তাঁর দুশ্চিন্তা। এই 'বর্ত্তমান' পাশ্চাত্য ভাবধারায় দীক্ষিত, আত্মবিস্মৃত, অধঃপতিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানকে অস্বীকার করার উপায় নেই, এবং ভূদেব অন্তত সপরিবারে আদর্শ হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তিনি 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করে লিখলেন, "তোমরা দুই ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও যে প্রকার গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান্ ও পরিজনের প্রতি প্রীতিমান্, সেইরূপ আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। তোমাদের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং যুবকদিগকে মানসচক্ষে রাখিয়া সমাজতত্ত্ব বিষয়ে স্বচিন্তার উদ্রেক করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি।" কিন্তু ভূদেব জানতেন তাঁর সমকালে অধিকাংশ 'ইংরাজীবিদ্যায় শিক্ষিত'জন 'আর্য্য-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন' ছিলেন না। ফলে সমগ্র গ্রন্থটি বিতর্কমূলক, এবং প্রধানত 'ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত' ভ্রান্ত ভারতবাসীকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বইটি লেখেন।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে 'জাতীয়ভাবে'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভূদেব প্রধান চারটি উপাদান নিয়ে আলোচনা করেছেন,—আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, ধর্ম এবং আচার-সাদৃশ্য, ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য, রাজ্যশাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য। কল্পনা বা স্বপ্ন সর্বদা যুক্তির

পথ অনুসরণ করে না, দু-একটি দৃষ্টান্ত নিলেই তা বোঝা যাবে। ভারতবর্ষে ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে ভূদেব লেখেন, "কোন একখানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দী, কি বাঙ্গালা, কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপনাপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণপ্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই—এই বলিলেই হইবে যে, সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয় না বটে, প্রতিবর্গের আদ্য অক্ষর দ্বারা তদ্বর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্যসিদ্ধি হয়, কিন্তু তাহাতে, উচ্চারণের যেরূপ পার্থক্য বুঝায়, তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে, সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা।" ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত ভূদেবের মন্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই; তামিল তেলেগু ভাষা 'ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই আশু বোধগম্য হইয়া' আসে নি এবং উচ্চারণগত পার্থক্যও কালক্রমে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে, গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ভবিষ্যবিচারকালে ভূদেব স্বচ্ছন্দে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক; অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।" 'ভূদেব-চরিত' গ্রন্থে হিন্দি ভাষা প্রচারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সামাজিক প্রগতি'র স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। অন্যান্য সমাজের সঙ্গে তুলনায় হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে ভূদেব নিঃসন্দেহ, এবং তার অন্যতম কারণ, "ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দুসমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অনুশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু সমাজের প্রকৃতি—শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজকে

শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন।" উনিশ শতকে প্রচারিত ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানের প্রধান সূত্রগুলি ভূদেব সমালোচনা করেছেন এবং ঐতিহাসিক বিজ্ঞান ও উপমাত্মক বিচারের অপপ্রয়োগ দেখিয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্যভাবের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে তুলনা করা হতো; ফলে, পাশ্চাত্যভাব বলতে ভূদেব বুঝেছেন স্বার্থপরতা, উন্নতিশীলতা, সাম্য, ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, বৈজ্ঞানিকতা, শাসনকর্তার সমাজ-প্রতিভূত্ব। ভূদেব পাশ্চাত্যভাবকে সর্বথা পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেন নি, অনেকক্ষেত্রেই তিনি সমন্বয়বাদী,—১. "হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষপ্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।" ২. "আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপীয় শিল্পশিক্ষা।" কিন্তু পাশ্চাত্যভাবের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর মনে হয়েছে সাম্য, ঐহিকতা ও স্বাতন্ত্রিকতা। 'সাম্য' সম্বন্ধে ভূদেবের বিতৃষ্ণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষভাবে জাতিভেদ-প্রথার সমর্থনকালে। তাঁর মতে ১. "জাতিভেদ-প্রথা মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহপ্রতিষেধ দৃঢ়সম্বদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া-দাওয়ার বিশেষ আঁটাআঁটি হইয়াছে।...উহা এদেশে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে।" ২. "জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনের গৌরবটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না।" ৩. "জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্পকার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আছে।" ৪. জাতিভেদ সত্ত্বেও "ব্রাহ্মণের ব্যবসায় ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে।" ৫. "একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ভিন্ন আর কাহারও অপেক্ষা অন্য বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে তেমন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না।" ৬. "জাতিভেদ-প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই অনেকটা

আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী।" অধুনা ভূদেব-প্রদত্ত জাতিভেদ-প্রথার সমর্থনে যুক্তিগুলি খণ্ডন করার চেষ্টা নিরর্থক, কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ-মনের ইতিহাসে ভূদেবের চিন্তার গুরুত্ব স্বীকার করতেই হবে। বক্তব্য ঐতিহ্যানুগত সন্দেহ নেই, কিন্তু যুক্তির অনুক্রম এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'ইংরাজাধিকার'-এর স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইংরেজ চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইংরেজের বণিকভাব, ইংরেজের রাজভাব এবং বৈদেশিকভাব—এই তিন দিক থেকে ভূদেব ইংরেজকে দেখেন, এবং কখনো সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও, সাধারণভাবে ইংরেজ চরিত্রের প্রশংসাই তিনি করেছেন। ভূদেব যথাসাধ্য নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন, "আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক্‌ভাবে রাজ্যলাভ, তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব, এবং তাঁহার জ্ঞান ও পরিণামদর্শনমূলক ন্যায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিকভাব প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎসহ একথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার সহিত তাঁহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সহানুভূতির ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবনা।" ভূদেবের শেষ মন্তব্যটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে মূল্যবান মনে হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায় এক হিসাবে গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এই পরিচ্ছেদে লেখক 'ভবিষ্যবিষয়ে' দৃষ্টিপাত করেছেন। প্রথমে তিনি ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানী-দের কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক মতবাদ, খ্রীষ্টান ধর্মীয় মতবাদ, কোম্‌তের পজিটিভিজ্‌ম, ফরাসী বিপ্লবের শিক্ষা, সাম্যবাদ এবং পরিণামবাদ—এগুলি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন, "ইউরোপীয় সমাজ-বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত 'স্বাধীনতা'র পরিবর্ত্তে 'শাস্ত্রাধীনতা'র

এবং 'সাম্যে'র পরিবর্ত্তে 'ন্যায়ানুগামিতা'র এবং 'ভ্রাতৃত্বে'র পরিবর্ত্তে 'ভক্তি, প্রেম এবং দয়া'র ধ্বনি উত্থিত হইলেই ভালো হয়।" ভারতবর্ষ এবং ইউরোপের সমাজব্যবস্থা স্বতন্ত্র, সুতরাং উভয়ের ভবিষ্যবিচারও স্বতন্ত্র। ভূদেব দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষ ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হলেও "উহাদিগের ধর্ম্ম লোপ না হইলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে না।" ভূদেব বিশ্বাস করেন ভারতবর্ষে আচার অক্ষয়; কালোচিত তার সামান্য কিছু পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু 'আচারলোপে নীতি-লোপও অবশ্যম্ভাবী।' আসলে আচার পরমধর্ম না হতে পারে, কিন্তু ধর্মরক্ষার প্রধানতম উপায়। "শাস্ত্রে যে আচারের উল্লেখ আছে তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপাল্য। এখনও ব্রাহ্মণেরাই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবাসী অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা যে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।"

হিন্দুসমাজের সারভূত কথা, ভূদেবের মতে, জাতিভেদ। বৌদ্ধরা "ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল জাতির লোককে তুল্যমূল্য করিলেন; সেইজন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন।" চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মও এই কারণে ব্যর্থ হলো। ভূদেব ভারতবর্ষের সমাজের যে ভবিষ্যরূপটি দেখেছেন, তা এই রকম —"ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক্ প্রভৃতির মধ্যে প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে আপনাপন বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত-সমাজ দৃঢ়-সম্বদ্ধ এবং হিন্দি-ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে।"

অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভূদেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেছেন। ভূদেবের মতে ইংরেজ শাসনের ফলে ক্রমশ ধনী নির্ধন হয়ে পড়ছেন। "এই মহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সুদূরদর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তৃগণ কেহ বা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহ বা স্বদেশীয় বিদ্যাদানের, বা স্বায়ত্তশাসন-শক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন।" ভূদেব সে কালে প্রাপ্ত নানাবিধ

পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে 'ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ' ভারতবর্ষে ইউরোপের তুলনায় কম। তাঁর বিচারে "ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জন্মিয়াছে এখানে তাহার নামগন্ধও নাই। অতএব জমিদার বা উকিল অথবা মহাজন ইহারাই দেশের সকল টাকা উদরসাৎ করিতেছে, কৃষক এবং শিল্পীরা সেইজন্যই নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে নাই।" এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ভূদেবের মতপার্থক্য অত্যন্ত প্রকট।

ভবিষ্যবিচারের উপসংহারে ভূদেব ইংরেজশাসনের সুফলের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, "ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার সুশাসন করিতেছেন; ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন। অতএব ইংলণ্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন।" বলা বাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীতে ভূদেবের মতো অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি এই বিষয়ে এক মত পোষণ করতেন, যদিও ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেব যখন এই মন্তব্য করছেন, তার অনেক আগেই ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। ভূদেবের ভাষায় "এতদ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজ রাজনৈতিকদের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা এবং প্রকৃতির উপযোগী নয়।" আসলে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুকরণে ভারতবর্ষে যে সব শিক্ষিত ব্যক্তি দাবি-আদায়ের রাজনীতি করছিলেন, তাঁদের প্রতি ভূদেবের সমর্থন নেই। ভূদেব 'স্বদেশীয় মহাপুরুষে'র আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছেন, যিনি 'জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম'রূপে আবির্ভূত হবেন।[১৩]

গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে ভূদেব ভারতবাসীর সামাজিক 'কর্ত্তব্যনির্ণয়' করেছেন। অন্ধ অনুকরণমূলক সমাজ-সংস্কার নিরর্থক। ধর্মই সকল কর্মের ভিত্তি। ভূদেব জাতীয় ভাবের উন্নতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু স্বজাতিপ্রেম সর্বোচ্চ আদর্শ নয়—

"সজীব নির্জ্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরে, আত্মনিমজ্জন করিতে চাহেন।" কিন্তু এই সঙ্গে "সম্প্রতি তিনি [অপর] একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" এইভাবে ভূদেব জাতীয়ভাব এবং সর্বেশ্বরবাদ ও একাত্মবাদকে মিলিয়েছেন।

কিন্তু কোনো কিছুই মেলে নি। মেলা সম্ভব ছিল না। মনুর বচন উদ্ধার করে "আচার প্রবন্ধ" লেখার সময়েই ভূদেবকে একাধিকস্থানে আপস-মীমাংসা করতে হয়েছে। আধুনিক জীবনযাত্রা, সামাজিক প্রবণতা কোনো কিছুই ভূদেবের আদর্শ পরিবারগঠন বা ব্যক্তিচরিত্র নির্মাণের সহায়ক ছিল না। পরিবার তখনই ভাঙতে শুরু করেছে, ব্যক্তির জীবনে আচারনিষ্ঠার অভাব ঘটেছে। ফলে সমাজকে কিভাবে ধরে রাখা সম্ভব? ভূদেবের নিজের জীবনে যে অসংগতি, তাঁর চিন্তাধারার মধ্যেও সেই অসংগতির ছাপ পড়েছে। দু' একটা দৃষ্টান্ত নিলেই এই আত্মবিরোধের পরিচয় মিলবে। বাল্যবিবাহের সমর্থনে ভূদেব সোচ্চার ও দ্বিধাহীন, কিন্তু বহুবিবাহ প্রসঙ্গে তিনি কুণ্ঠিত, সেখানে তিনি বলেন, "এক পুরুষকে কি একাধিক স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে না—পারে। এক পুরুষ কি একাধিক স্ত্রীকে ভালোবাসিতে পারে না?—তাহাও পারে, কিন্তু এই যে ভালোবাসা এ তেমন ভালোবাসা নয়।" এবং এর পরই ভূদেবকে 'অধিকারিভেদে ব্যবস্থাভেদে'র কথা বলতে হয়েছে। আসলে শাস্ত্রে বহুবিবাহের সুস্পষ্ট নিষেধ পাওয়া যাচ্ছে না (বরং পৌরাণিক কাহিনীতে দেবতা থেকে মানুষ অনেকেই বহুবিবাহ করেছেন এমন নিদর্শন আছে), অথচ এ কালে বহুবিবাহ ভূদেবের মনঃপূত নয়। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় আপত্তিবোধ ভূদেবের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক (পরাশর অবশ্যই তাঁর কাছে অগ্রাহ্য)। ভূদেব বলবেন "বৈধব্য একটি মহৎ ব্রত", কিন্তু এ কালে শাস্ত্রবচনের উপর লোকের তেমন আস্থা নেই, তাই ভূদেব বৈধব্যপালনের পক্ষে

একটি অদ্ভুত যুক্তি উপস্থিত করেন, "যখন মদ্যসেবী মাংসাহার ইউরোপীয়গণের কন্যাগণও ধর্মশিক্ষার প্রভাবে চিরকৌমারব্রতের নিয়ম যথাযথ পালন করিতে পারিতেছে, তখন অত্যুদার সংস্কৃত শাস্ত্রের সাহায্যে পবিত্র আর্য্যবংশোদ্ভবা বিধবা-দিগের ব্রহ্মচর্য্য পালন না হইবার কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।" ("পারিবারিক প্রবন্ধ")।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের কুফল বলতে ভূদেব বোঝেন, "এক ইংরাজদিগের অনুকৃতি। দ্বিতীয় ইংরাজদিগের প্রবর্ত্তিত সাম্যবাদের বহুল বিস্তার।" তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "দেখ ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে আমাদিগের জাতীয় আচার পদ্ধতির বিলোপসাধন হইতেছে।" এবং "ইংরাজদিগের গৃহকার্য্যের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা না জানায়, আর ইংরাজদিগের মৌখিক সাম্যবাদে উন্মত্ত হওয়ায়, আমাদিগের অপরাপর যে সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহার তো ইয়ত্তা নাই—গৃহাভ্যন্তরে বড়ই বিপ্লব সংঘটিত হইতেছে।" কিন্তু পারিবারিক আদর্শরক্ষায় বা আচার প্রবর্তনে ভূদেব বিভিন্ন স্থানে আত্মপক্ষ সমর্থনে সেই ইংরাজেরই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেছেন। সম্ভবত এইখানেই ভূদেব অসহায়—যাঁদের জন্য তিনি 'আচার প্রবন্ধ'-'পারিবারিক প্রবন্ধ'-'সামাজিক প্রবন্ধ' লিখেছেন তাঁরা ইংরেজি-শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়, এঁদের কাছে শুধু প্রাচীন ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র উদ্ধার করে কোন লাভ নেই। অন্যদিকে রিচার্ডসনের ছাত্র, উচ্চরাজকর্মচারী ভূদেবের পক্ষে শশধর তর্কচূড়ামণির ভূমিকা নেওয়াও সম্ভব নয়। তাই ভূদেবের মধ্যে প্রাচীনপন্থার প্রতি সানুরাগ মমতাবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাঁর জীবন এবং রচনাবলীতে ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির প্রাধান্য ঘোষিত হয়েছে।

জিজ্ঞাসা, মাঘ ১৩৮৭।

১. দ্র. অলোক রায়, 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাঙালী সমাজ-মন' ; সুমিতচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত "সাহিত্য-পরিক্রমা", কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ৬৪-৭৭।

২. হিন্দু কলেজে ভূদেব যাঁদের সঙ্গে পড়েছিলেন পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তি। বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ভূদেবের যোগাযোগ ছিল, কিন্তু কারোর সঙ্গেই যথার্থ মনের মিল ছিল না।

৩. উনিশ শতকে রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্দ্র, কিশোরীচাঁদ, নবীনচন্দ্র অনেকেই সরকারি কাজ করেছেন, কিন্তু প্রায় কারো সঙ্গেই সাহেব ওপরওয়ালার ভালো সম্পর্ক ছিল না।

৪. [মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়], "ভূদেবচরিত", প্রথম ভাগ, কলিকাতা ১৩২৪। দ্বিতীয় ভাগ, ১৩৩০। তৃতীয় ভাগ, ১৩৩৪।

৫. ভূদেব "আচার প্রবন্ধে" (১৩১৫ সংস্করণ) ব্রাহ্মণের ছয়টি কার্য এবং তিনটি জীবিকার কথা বলার পর সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন—"অন্যের দ্বারা কৃষি, বাণিজ্য এবং কুসীদ গ্রহণ কার্য্য চালাইয়াও ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, এবং আপৎকালে স্বয়ংও ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন।...ঋষিরা জীবিকার অনেক উপায় বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কুসীদ গ্রহণই উৎকৃষ্ট। জীবিকার জন্য ভৃতি স্বীকারও অনিষ্ট নহে।" (পৃ. ৫৩)।

৬. ১০।৩।৯৩ চুঁচুড়া থেকে ভূদেব তাঁর তৃতীয় পুত্রকে লেখেন—"অনেক বৎসর চাকুরীতে সে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, ছুটির সময় আমার মূলধনের সুবিধাজনক ব্যবহারে (বনেলিতে টাকা ধার প্রভৃতি) সে তদপেক্ষা অধিক অর্থ বৃদ্ধি করিয়াছে। আমার বিশ্বাস—সে আমাদের চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়াইয়াছে। কিন্তু এরূপ 'কর্জ দেওয়ার ব্যবসায়' সকল সময়ে নিরাপদ নহে এবং অনেক সময় ঐ কার্য্যে থাকিতে থাকিতে লোক ক্রমশঃ

বৈশ্যভাবে অত্যধিক অগ্রসর হইয়া পড়ে। সেই জন্য যাহাদের অবকাশ অধিক, তাহাদের ঐ কার্য্যে হাত না দেওয়াই ভাল।" "ভূদেব চরিত", ৩, পৃ. ৩৭৯।

৭. "সাঁওতাল পরগণার কুণ্ডোহিত জমিদারীর উপর যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল তাহা আদায় জন্য উহা নীলামে খরিদ করিলে ভূদেববাবুর দ্বিতীয় পুত্রের ইচ্ছা হয় যে জমিদারীটি রাখা হয়; কিন্তু তাঁহার তৃতীয় পুত্রের অন্যরূপ মন হয়। সেই উপলক্ষে ভূদেববাবু ১০।৪।৮৮ তারিখে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে লেখেন, 'জমিদারীটি রাখা হইবে কি উহা বেচিয়া ফেলাই ভাল, তাহা আমি নিশ্চয়ভাবে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে সাবধান ও সতর্ক হইয়া চালাইতে পারি তবে জমিদারীটি রাখা মন্দ নয়, তাহাতে আথিক লাভ হইবে—আর ইহার কতক অংশ শিক্ষার উন্নতিতে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।...যদি বংশে কিছু জমিদারী করিতে হয় তাহা হইলে ইহা যে একটি উত্তম সুযোগ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ কি?" "ভূদেবচরিত", ৩, পৃ. ২২৩-২৪।

৮. "হিন্দুকণ্ঠহার" (১৯১৭) গ্রন্থের মুখবন্ধ। "ভূদেবচরিত", ৩, পৃ. ৩৬০-৬১।

৯. দ্র. "ভূদেব চরিত", ১, পৃ. ১৭৩-৭৮।

১০. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্র', সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ", পৃ. ৩০৩-৩০৪।

১১. "ভূদেবচরিত", ৩, পৃ. ৩৯১।

১২. ভূদেব ২৮।৮।৯২ তারিখ দিনপঞ্জিতে লিখেছেন, "সামাজিক প্রবন্ধ এডুকেশন গেজেটে পড়িয়া কেহ কেহ বলেন যে, উহাতে গবর্ণমেন্টের বিরোধী কথা আছে,—পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। আমার মনে হয়, সেরূপ কিছু নাই এবং সেই জন্য উহার মুদ্রণ শেষ করাইয়াছি। তথাপি সাধারণের

নিকট প্রকাশ সম্বন্ধে মতামতের জন্য এক একখানি মুদ্রিত সামাজিক প্রবন্ধ গোবিকে, চন্দ্রনাথ বসুকে, অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে এবং সারদা মিত্রকে পাঠাইলাম।" "ভূদেব চরিত", ৩, পৃ. ৩৪৬।

১৩. দ্র. 'আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যতদিন আমাদিগের মধ্যে তাদৃশ কোন নেতৃমহাপুরুষের আবির্ভাব না হইতেছে, তাবৎকাল আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভারত-গবর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইব না।'—"সামাজিক প্রবন্ধ" (১৩৫৫), পৃ. ৩০০-৩০১।

ভূদেবচর্চায় সাম্প্রতিক সংযোজন—

Tapan Raychaudhuri, Europe Reconsidered, O.U.P. 1988.



বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসভাবনা

বঙ্কিমচন্দ্র পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না। ইতিহাস-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল। কিন্তু সমগ্র জীবন ইতিহাসচর্চায় নিয়োজিত হয় নি।[১] ফলে ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি যে-প্রবন্ধগুলি লিখেছেন সেগুলি অনেক পরিমাণে শৌখিন অর্থাৎ সাময়িক ইতিহাসচর্চার নিদর্শন। ইতিহাসের তত্ত্ব-দর্শন নিয়েও তিনি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসভাবনার যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা ছড়িয়ে আছে দুই খণ্ড 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত কয়েকটি প্রবন্ধে। আর বিভিন্ন-জনের স্মৃতিকথায় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর কিছু মন্তব্যে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কাব্যের চেয়েও ইতিহাসেই তাঁহার বেশী সখ ছিল। ইউরোপের ইতিহাস তিনি খুব পড়িয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই ফ্লরেন্সের মেডিচিদের কথা কহিতেন। 'রিনাইসেন্স' (Renaissance) ইতিহাস তিনি খুব আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং সেই পথ ধরিয়া বাঙ্গলারও যাহাতে আবার নবজীবন সঞ্চার হয়, তাহার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি বাঙ্গলার একখানি ইতিহাস লিখিয়া যান। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনে সাতটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।"[২] সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা দেওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ডেভিড হিউমের হিস্ট্রি অফ ইংল্যাণ্ড, উইলিয়াম রবার্টসনের হিস্ট্রি অফ দি রেইন অফ চার্লস দি ফিফ্‌থ, জেমস মিলের হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া, আর মন্‌স্টুয়ার্ট এলফিন্‌স্টোনের রাইজ অফ দি ব্রিটিশ পাওয়ার ইন দি ইস্ট পড়েছিলেন। হুগলি কলেজ লাইব্রেরিতে ইতিহাসের বইয়ের সংগ্রহ ছিল বেশ ভালো, সে সব বইয়ের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। কলেজে বঙ্কিম-

চন্দ্র আইরিস অধ্যাপক জেম্‌স গ্রেভ্‌সের কাছে ইতিহাস পড়েছেন। বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় তাঁকে পড়তে হয়েছে, "History which included History of England and of British India and Ancient History with special reference to the History of Greece to the death of Alexander ; History of the Rome to the death of Augustus and the History of the Jews."[৩] অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র একা নন, সে সময় শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-প্রস্তুতি হিসাবে এই পাঠক্রমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত পাঠক্রমের বাইরেও পড়াশোনা করেছেন (বিশেষভাবে ইতালি, ফ্রান্স ও জার্মানির ইতিহাস), অন্তত ছাত্রজীবন থেকে ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তবে অধ্যয়ন বা অনুরাগ মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু ইতিহাস রচনার ইচ্ছা স্বতন্ত্র বস্তু। বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে যখন সাহিত্য সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত তখন ভারতবর্ষের বা বাংলা দেশের ইতিহাস রচনার আগ্রহ কেন তাঁর মনে দেখা দিল তার কারণ সন্ধান করে দেখা দরকার।

১৮৮০ সালের ১৫ জুলাই তারিখে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, যখন তিনি 'আনন্দমঠ' উপন্যাস লিখছেন তখনই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার কাজে হাত দিয়েছেন, যদিও কয়েক পরিচ্ছেদের পর আর লেখা হয়ে ওঠে নি—"I am afraid that History is not likely to make much progress. I have, however, got through a few chapters and also through a novel—so to call it—but I have not the slightest idea when the latter will be ready for publication."[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের একটি খসড়া-খাতায় ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়—"Character of the Ancient Hindus, Maritime power and habits, External Commerce, Manners and customs

(women and widow marriage), Dates of authors, wealth of Ancient India, Government, Military power, Arab expedition, Arab Geographers, Historicial and Miscellaneous."[৫] ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থের কাঠামো গ্রহণ করেন নি। ভারত-জিজ্ঞাসা চালিত হয়ে তিনি সম্ভবত কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে চেয়েছেন, যার মধ্য দিয়ে অতীত-ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু সে সময় একক প্রচেষ্টায় এ ধরনের কাজ করে ওঠাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৮৪ সালে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার ইতিহাস লেখার কি হইল?' তখন বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "এখন ওসব হয় না। যদি কখনও চাকরি ছাড়িয়া কোন লাইব্রেরিতে বসিয়া পড়িতে পাই, তবে লিখিব। এখন কিছু হয় না। তোমরা ত পাঠক বাড়াইতেছ, তখন একবার দেখা যাবে।"[৫(ক)] ১৮৯১ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর পড়ালেখার তিনি আর বিশেষ সুযোগ পান নি।

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস নিয়ে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য তিনি লেখেন অন্তত নয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ —১। ভারত-কলঙ্ক (বৈশাখ ১২৭৯) ২। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা (ভাদ্র ১২৮০) ৩। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার (ভাদ্র· ১২৮০, অগ্রহায়ণ ১২৮২) ৪। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি (আশ্বিন ১২৮০) ৫। বাঙ্গালির বাহুবল (শ্রাবণ ১২৮১) ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস (মাঘ ১২৮১) ৭। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা (অগ্রহায়ণ ১২৮৭) ৮। বাঙ্গালীর উৎপত্তি (পৌষ ১২৮৭—জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮) ৯। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯)। এর সঙ্গে যোগ করা যায় 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' (শ্রাবণ ১২৯১)। 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে পরে প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রিত হলেও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই ধরনের বিক্ষিপ্ত সাময়িক রচনার সীমাবদ্ধতা জানতেন, তাই 'বিবিধ প্রবন্ধে'

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের (১৮৯২) ভূমিকায় মন্তব্য করেন, "এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে, এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।···যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়নজন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী বা কম হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ, আমি ত কুলি মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না।"[৬] এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসচর্চার পশ্চাদপট শুধু বিবৃত হয় নি, সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অতৃপ্তি। ১৮৯২ সালেও তাঁর মনে হয়েছে, যে-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ নিয়ে ইতিহাসচর্চায় অগ্রসর হয়েছিলেন তা অন্য কারও দ্বারা পূর্ণ হলো না।

অথচ গত শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবাসী ইতিহাসচর্চায় বিরত ছিল, এমন মনে করার কারণ নেই। বাঙালি পেশাদার ঐতিহাসিকেরও আবির্ভাব হয়েছে এ সময়ে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে ইতিহাস-জিজ্ঞাসা থেকে প্রবন্ধ লেখেন, যাকে এক-কথায় সমাজচেতনা বলতে পারি, অন্য কারও লেখায় ঠিক তার নিদর্শন মেলে না। 'কোন্ পথে অনুসন্ধান' করতে হবে তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, যথা—পালরাজ্য ও সেনরাজ্য "একীকৃত হইলে পর, মুসলমান কর্ত্তৃক জয় পর্য্যন্ত এই বৃহৎ

সাম্রাজ্যের কিরূপ অবস্থা ছিল। রাজশাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, শান্তিরক্ষা কিরূপে হইত। রাজসৈন্য কত ছিল, কি প্রকার ছিল, তাহাদিগের বল কি, বেতন কি, সংখ্যা কি? রাজস্ব কি প্রকারে আদায় করিত, কে আদায় করিত, কি প্রকারে ব্যয়িত হইত, কে হিসাব রাখিত? কতপ্রকার রাজকর্মচারী ছিল, কে কোন্ কার্য্য করিত, কি প্রকারে বেতন পাইত, কোন্‌রূপে কার্য্যসমাধা করিত? কে বিচার করিত, বিচারের নিয়ম কি ছিল, বিচারের সার্থকতা কিরূপ ছিল, দণ্ডের পরিমাণ কিরূপ ছিল, প্রজার সুখ কিরূপ ছিল! ধান্য কিরূপ হইত, রাজা কি লইতেন, মধ্যবর্ত্তীরা কি লইতেন, প্রজারা কি পাইত, তাহাদিগের সুখদুঃখ কিরূপ ছিল? চৌর্য্য, পূর্ত্ত, স্বাস্থ্য, এ সকল কিরূপ ছিল? কোন্ কোন্ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল,—বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্ব্বাক, বৈষ্ণব, শৈব, অনার্য্য, কোন্ ধর্ম্ম কতদূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে কে দার্শনিক, স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত কি কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থের দোষগুণ কি কি? তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙ্গালির চরিত্র কি প্রকারে তদ্দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? তখনকার লোকের সামাজিক অবস্থা কিরূপ? সমাজভয় কিরূপ? ধর্ম্মভয় কিরূপ? ধনাঢ্যের অশনপ্রথা, বসনপ্রথা, শয়নপ্রথা কিরূপ? বিবাহ, জাতিভেদ কিরূপ? বাণিজ্য কিরূপ, কি কি শিল্পকার্য্যে পারিপাট্য ছিল? কোন্ কোন্ দেশোৎপন্ন শিল্প কোন্ কোন্ দেশে পাঠাইত? বিদেশযাত্রার পদ্ধতি কিরূপ ছিল? সমুদ্রপথে বিদেশে যাইত কি? যদি যাইত, তবে জাহাজ বা নৌকার আকারপ্রকার কিরূপ ছিল? কোন্ প্রদেশীয় লোকেরা নাবিক হইত? কোম্পাস্ ও লগ্‌বুক্ ভিন্ন কি প্রকারে নৌযাত্রা নির্বাহ করিত? বালী ও যবদ্বীপ সত্য সত্যই কি বাঙ্গালির উপনিবেশ? প্রমাণ কি? ভিন্নদেশ হইতে কি কি সামগ্রী আমদানি হইত, পণ্যকার্য্য কি প্রকারে নির্ব্বাহ হইত?"[৭] এই রকম পাঠান ও

মোগলযুগ সম্বন্ধে আরও অসংখ্য প্রশ্ন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই সব প্রশ্ন থেকে নীহাররঞ্জন রায়ের মনে হয়েছে, "তাঁহার মন দেশকালধৃত ইতিহাসের এই সমগ্ররূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিল বলিয়া মনে হইতেছে।...[৮]

দেশকালধৃত ইতিহাসের সমগ্ররূপ কেমন করে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। 'ইতিহাসের কোনো যুক্তি, কার্যকারণ সম্বন্ধের কোনও ব্যাখ্যা বা ইঙ্গিত' যদি না দেওয়া যায় তাহলে ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয় মেলে না। অথচ এই পদ্ধতির বিপজ্জনক প্রবণতা সম্বন্ধেও আমরা অবহিত, যেমন, 'বাঙ্গালির বাহুবল' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিপাদ্য—"যদি কখন (১) বাঙ্গালির হৃদয়ে কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে। বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না।"[৯] বলাবাহুল্য, এখানে সমাজতত্ত্বের একটি সাধারণসূত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখা যায়, যদিও তার পিছনে আছে উনিশ শতকের নবজাগ্রত স্বাজাত্য-বোধের উত্তেজনা।

অন্যদিকে লক্ষণীয়, ইতিহাসের ঘটনাবলি থেকে নিয়ম আবিষ্কারে বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ। উনিশ শতকে ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর পিছনে নিয়ম-সন্ধানের প্রয়াস দেখা যায়, মনে হয়, "সকলই নিয়মের ফল।...বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।"[১০] এ থেকেই তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক ইতিহাস' ধারণার উদ্ভব।[১১] বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেকি (William Edward Hartpole Lecky. 1838—1903; ***History of Rationalism***, 1865) এবং বাক্‌লের (Henry Thomas Buckle, 1821–1862, ***History of Civilization in England***, 1857, 1861) রচনার কথা বলেছেন, যা থেকে মনে হয়, তিনি ইতিহাসকে শুধু প্রমাণনির্ভর মনে করতেন

না, ইতিহাসকে ভবিষ্যদ্বক্তাও মনে করতেন। আসলে তিনি উনিশ শতকের ইউরোপীয় 'আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের' মতোই বিশ্বাস করতেন 'সকলই বাহ্য প্রকৃতির ফল।' বলা যেতে পারে, এরই অনুসিদ্ধান্ত, 'বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ উক্তির নিয়ম এই যে, যেরূপ [যে অবস্থায়] হইয়াছে, সেই অবস্থায় সেই রূপ আবার হইবে।" তবে 'ইতিহাস' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করতেন না।[১২] ইতিহাস বলতে তিনি কখনো বোঝেন অতীত পুরাবৃত্ত, আবার কখনো সামাজিক ও মানসিক চিত্তবৃত্তির বিকাশ। কিন্তু প্রায় কখনোই রাষ্ট্রীয় বিবরণকে তিনি যথার্থ ইতিহাস মনে করেন না। ভারতীয় দর্শনের আলোচনায় তাই তিনি হিন্দু বৈরাগ্যসাধনের ইতিহাস সন্ধান করেন, "He who will write the history of Hindu asceticism, from its first appearance in the Vedic Theology to its most complete development in the Buddhistic philosophy, will earn a title to the gratitude of India. Lecky has shown, with a power of gloomy narration rarely surpassed, the evil influence of asceticism upon the destinies of mediaeval Europe, but no country in the world has suffered more deeply from its baneful power than India. Both the mythology and the philosophy were intensely imbued with the ascetic spirit. Buckle has shown how the imposing aspects and unconquerable forces of nature create superstition."...ইত্যাদি[১৪]। সাংখ্যদর্শনের পরিচয়দানকালেও তিনি অনুরূপ ভাবে লেখেন, "যিনি হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝিলে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান জন্মিবে না; কেন না, হিন্দুসমাজের পূর্ব্বকালীন গতি অনেকদূর সাংখ্যপ্রদর্শিত পথে হইয়াছিল। যিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের চরিত্র বুঝিতে চাহেন, তিনি সাংখ্য অধ্যয়ন করুন। সেই চরিত্রের মূল সাংখ্যে অনেক

দেখিতে পাইবেন। সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ নিবারণমাত্র আমাদিগের পুরুষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতির হাড়েং প্রবেশ করিয়াছে, এমন, বোধ হয়, পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে হয় নাই। তাহার বীজ সাংখ্যদর্শনে। তন্নিবন্ধন ভারতবর্ষে যে পরিমাণে বৈরাগ্য বহুকাল হইতে প্রবল, তেমন আর কোন দেশেই নহে। সেই বৈরাগ্য প্রাবল্যের ফল বর্ত্তমান হিন্দুচরিত্র। যে কার্য্যপরতন্ত্রতার অভাব আমাদিগের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিদেশীয়েরা নির্দ্দেশ করেন, তাহা সেই বৈরাগ্যের সাধারণতা মাত্র। যে অদৃষ্টবাদিত্ব আমাদিগের দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ, তাহা সাংখ্যজাত বৈরাগ্যের ভিন্ন মূর্ত্তি মাত্র। এই বৈরাগ্যসাধারণতা এবং অদৃষ্টবাদিত্বের কৃপাতেই ভারতবর্ষীয়-দিগের অসীম বাহুবল সত্ত্বেও আর্য্যভূমি মুসলমান-পদানত হইয়াছিল। সেইজন্য অদ্যাপি ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই জন্যই বহুকাল হইতে এ দেশে সমাজোন্নতি মন্দ হইয়া, শেষে অবরুদ্ধ হইয়াছিল।"[১৫] প্রায় এই একই কথা 'ভারত-কলঙ্ক' প্রবন্ধেও বলা হয়েছে, "আর্য্য ধর্ম্মতত্ত্বে, আর্য্য দর্শনশাস্ত্রে এই অচেষ্টাপরতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, কি পৌরাণিক ধর্ম্ম, সকলই এই নিশ্চেষ্টতারই সম্বর্দ্ধনাপরিপূর্ণ। বেদ হইতে বেদান্ত সাংখ্যাদি দর্শনের উৎপত্তি; তদনুসারে লয় বা ভোগক্ষান্তিই মোক্ষ; নিষ্কামত্বই পুণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের সার,—নির্ব্বাণই মুক্তি।"[১৬] কিন্তু শুধু ভারতীয় চরিত্রের বতর্মান-অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঙ্গে অবস্থান্তরের উপায়ও নির্দেশ করেন। 'স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা' একদিন ভারত-কলঙ্ক দূর করতে সক্ষম হবে, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। এবং সে প্রবন্ধ রচনার প্রয়াসকে আধুনিককালে ইতিহাস রচনার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি দেখা দিলেও, ভারতবাসীর ইতিহাসচর্চার অন্যতম আদি প্রেরণা যে এখানেই নিহিত ছিল তা স্বীকার করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন, "কোন দেশের ইতিহাস লিখিতে গেলে সেই দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা চাই"[১৭] তখন এ কালের পাঠক 'ধ্যান' শব্দটি নিয়ে একটু বিব্রতবোধ করলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মনে

হতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে এখানে এক স্বতন্ত্র তাৎপর্য দিতে চান, যার সঙ্গে ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার ('ইতিহাস সীমাবদ্ধ দেশে খণ্ডকালের ইতিহাস।') কোনো মিল নেই। আসলে ইতিহাস বলতে আমরা ঠিক কি বুঝব, তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অনেক বিতর্ক জমে আছে[১৮] তবে লর্ড অ্যাক্টনের মতো 'আলটিমেট হিস্ট্রি'তে সম্ভবত এখন আর কেউই বিশ্বাস করেন না।[১৯] রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 'রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস' তখন তাঁর কাছে ইতিহাস হলো 'ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প'[২০] তার পরিচয় গ্রহণ। তাই বলে 'সময়বিশেষকে' অবলম্বন করে যে ইতিহাস গড়ে ওঠে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ কম ছিল না—তবে ধ্যানের ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা থেকে তিনি রচনা করেছেন 'রামায়ণ' (১৯০৩) প্রবন্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রও 'কমলাকান্ত' গ্রন্থে অনুরূপভাবে 'আমার দুর্গোৎসব' বা 'একটি গীত' রচনায় 'সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা'র ধ্যানমূর্তি প্রত্যক্ষ করেছেন, "মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বঙ্গলক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অৰ্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল; যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে, দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল।

আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশে মেঘ ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ, জলে, ক্রমে২ সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতলজলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই বঙ্গলক্ষ্মী কোথায় গেলেন—"[২১] কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ দিব্যদৃষ্টি দিব্যকর্ণের অধিকারী, ফলে তাঁর পক্ষে যবনসেনা কর্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের এই চিত্র প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এমন কি 'মৃণালিনী'র মতো রোমান্স-কাহিনীতেও এই ধরনের বর্ণনা স্থান পেতে পারে। কিন্তু এখানে ইতিহাসের বস্তুদৃষ্টির সন্ধান করে লাভ নেই, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একে ইতিহাস বলেন নি। কিন্তু বস্তুদৃষ্টির পিছনে যে ভাবদৃষ্টি লুকিয়ে আছে, যথার্থ ইতিহাস রচনার জন্য তার প্রয়োজন আছে। তা না হলে 'দেশের ইতিহাসের প্রকৃত যে ধ্যান' তা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রবন্ধের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র যে-ধ্যানের কথা বলেন, তাঁর সঙ্গে মিস্টিক উপলব্ধির কোনো যোগ নেই, তাই ধ্যানের ব্যাখ্যায় তিনি লেখেন, "এই দেশ কি ছিল? আর এখন এ দেশ যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, কি প্রকারে, কিসের বলে এ অবস্থান্তর প্রাপ্তি, ইহা আগে না বুঝিয়া ইতিহাস লিখিতে বসা অনর্থক কালহরণ মাত্র।...বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িতে বসিয়া আমরা পড়িয়া থাকি, পালবংশ সেনবংশ বাঙ্গালার রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিলেন, পাঠানেরা বাঙ্গালায় রাজা হইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকলই ভ্রান্তি; কেন না, সেন, পাল ও বখতিয়ারের সময় বাঙ্গালা বলিয়া কোন রাজ্য ছিল না। এখনকার এই বাঙ্গালা দেশের কোন নামান্তরও ছিল না। সেন ও পাল গৌড়ের রাজা ছিলেন, বখতিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী বাঙ্গালার প্রাচীন নাম নহে। বাঙ্গালী বলিয়া কোন জাতি তথাকার অধিবাসী ছিল না। যাহাকে এখন বাঙ্গালা বলি, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার এক অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির

সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালী হইয়াছে।"[২২] বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি আধুনিক তথ্যবিচারে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও তিনি সেখানে দেশ-কাল-জাতির তথ্যমূলক পরিচয়ই দিতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়। যেখানে তিনি লোকপ্রচলিত কিংবদন্তির উল্লেখ করেছেন, যেমন হবচন্দ্র রাজা ও গবচন্দ্র পাত্রের গল্প, সেখানেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানান, "এ ইতিহাস নহে—এ সত্যও নহে—এ পিতামহীর উপন্যাস মাত্র। তবে এ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে এই অমূলক গালগল্পকে স্থান দিলাম কেন ? এই কথাগুলি রাজার ইতিহাস নহে, লোকের ইতিহাস বটে। ইহাতে দেখা যায়, যে রাজপুরুষদিগের সম্বন্ধে এতদূর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক গল্প বাঙ্গালীর মধ্যে প্রচারলাভ করিয়াছে। ভবচন্দ্র [হবচন্দ্র] রাজা ও হবচন্দ্র [গবচন্দ্র] পাত্রের দ্বারাও বাঙ্গালায় রাজ্য চলিতে পারে, ইহা বাঙ্গালীর বিশ্বাস।"[২৩]

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (মাঘ ১২৮১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৫-১৮৮৬) 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' বইটি নিয়ে আলোচনার সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "যাঁহারা বালপাঠ্য পুস্তক বলিয়া ঘৃণা করিয়া ইহা পড়িবেন না, তাঁহাদিগের জন্য, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে উপলক্ষ করিয়া, আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলিব। সকলই অধ্যয়নীয় তত্ত্ব ইহাতে পাওয়া যায় বলিয়া আমরা এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত, নচেৎ বালপাঠ্য পুস্তক আমরা সমালোচনা করি না।"[২৪] বালপাঠ্য এই পুস্তিকার লেখকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকখানি প্রত্যাশা ছিল। এবং সে কথা তিনি জানিয়েছেন। অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি বলেন সেগুলি ঈষৎ পরিবর্তন করে তাঁর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য—

> [বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ] লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। [বঙ্কিমবাবু] মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন ; তাহা না লিখিয়া তিনি [মাসিক

পত্রিকার জন্য অল্প কয়েকটি প্রবন্ধ] লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে। মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি।

মনে হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আমরা বড়ো বেশি দাবি করছি। ইতিহাস রচনার কি যোগ্যতা ছিল তাঁর? অবশ্য রাজকৃষ্ণের বইটির সঙ্গেও একালের অধিকাংশ পাঠকের প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় রাজকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমের মন্তব্যও অনেকের কাছে অত্যুক্তি ঠেকতে পারে। বঙ্কিমের মতো রাজকৃষ্ণও পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না। কিন্তু 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' পড়ার সুযোগ পেলে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মনেও প্রশ্ন জাগবে, ১৮৭৪ সালে কেমন করে বালপাঠ্য এমন একটি বই লেখা সম্ভব হলো। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এমন কি রামদাস সেনের মতো রাজকৃষ্ণ সারাজীবন পুরাতত্ত্বের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি।[২৫] স্কুলে পাঠ্য নির্বাচিত হলে অর্থাগমের উপায় হবে ভেবেই সম্ভবত 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' লেখা হয় (অনুরূপভাবে রাজকৃষ্ণ লিখেছেন 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ' এবং 'প্রথম শিক্ষা বীজগণিত') এবং সেদিক থেকে লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল বলে মনে হয়, কারণ বাইশ বছরের মধ্যে বইটির চুয়ান্নটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র (ডবল ক্রাউন ৯০ পৃষ্ঠা) এবং বালকদের 'প্রথম শিক্ষার' প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে বইটি লেখা হলেও, দুটি কারণে রাজকৃষ্ণের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথমত, "অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন, এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য।" দ্বিতীয়ত, "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"[২৬] নতুন কথা বলতে বুঝতে হবে, ইংরেজিতে লেখা প্রচলিত ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ না করে রাজকৃষ্ণ যেখানে ঘটনার নতুন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 'বঙ্গদর্শন' (ভাদ্র

১২৮১) পত্রিকায় 'ঐতিহাসিক ভ্রম' নামে প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ দৃষ্টান্ত হিসাবে এই রকম তিনটি নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন—"অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটি এই যে বাঙ্গালিরা কখনও বিদেশ বিজয় করে নাই ; দ্বিতীয়টি এই যে, যে দিন বখতিয়ার খিলিজি সপ্তদশজন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেনবংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গালা দেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল'; তৃতীয়টি এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমিদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটি সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।"[২৭] বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রাজকৃষ্ণের প্রদত্ত যুক্তি ও তথ্য সমর্থন করেন নি, তিনি নিজেও দীর্ঘদিন এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তগুলির বিরোধিতা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এর সঙ্গে আরও দুটি বক্তব্যের সপক্ষে রাজকৃষ্ণের পরোক্ষ সমর্থন দাবি করেছেন—(১) "পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দ্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দ্দশা ঘটে নাই।... পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।" (২) "যে আকবর বাদশাহের আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। তিনিই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালার শ্রীহানির আরম্ভ। মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের অধিক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র।"[২৮]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, রাজকৃষ্ণ বা বঙ্কিমের হাতে যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্য ছিল অল্প। নিরপেক্ষ ইতিহাস বলে কোনো বস্তুও তখন ছিল কি না সন্দেহ। এরই মধ্যে তাঁদের ইতিহাসচর্চা। ফলে তাঁদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতটুকু কৃতিত্ব তাঁরা দাবি করতে পারেন তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বখতিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের কথা বলতে পারি। সপ্তদশ অশ্বারোহীর কাহিনী বা খিলিজির সমগ্র বঙ্গদেশে অধিকার

বিস্তার 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' বিবেচনায় সেই কলঙ্কক্ষালনের উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র নতুন 'সিদ্ধান্ত' প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী—এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকও স্বীকার করেন—"বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনীতে লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ হইতে পলায়নের কথা বিবৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু, তিনিই প্রথমে সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের অসম্ভবতা প্রমাণের জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তখনও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র কোন বিশ্বাসযোগ্য সংস্করণ মুদ্রিত হয় নাই, 'রাভার্টি'র অনুবাদ মুদ্রিত হয় নাই, তখন ইলিয়ট কর্তৃক প্রকাশিত 'তাজ-উল্-মাসি'র ও 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'র সারাংশমাত্রই এতদ্দেশীয় লেখক ও পাঠকবর্গের একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার মুসলমান-বিজয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।"[২৯]

কিন্তু রাজকৃষ্ণের বালপাঠ্য পুস্তিকাটি নতুন কোনো তথ্যের জন্য তেমন মূল্যবান পরিগণিত হয় নি, যেমন মূল্যবান মনে হয়েছে ইতিহাসকাহিনী পরিবেশন-রীতির অভিনবত্বের জন্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে কোথায় কোন্ পথে বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হবে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেখানেই তিনি সাহেবদের লেখা 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে আপত্তিবোধ জানিয়েছেন, "সাহেবেরা ইতিহাস সম্বন্ধে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শম্যান লেথব্রিজ প্রভৃতি চুটকিতালে বাঙ্গালার ইতিহাস লিখে, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।" বই লেখা হয়েছে অনেক, "কিন্তু এ সকলে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙ্গালার বাদসাহ, বাঙ্গালার সুবাদার ইত্যাদি নিরর্থক উপাধিধারণ করিয়া, নিরুদ্বেগে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়িভোজন মাত্র। ইহা বাঙ্গালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙ্গালার ইতিহাসের

এক অংশও নয়। বাঙ্গালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধও নাই। বাঙ্গালি জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।"[৩০]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, সাহেবের লেখা বা 'হিন্দুদ্বেষী' মুসলমানের লেখা বলেই প্রাচীন বা অর্বাচীন তথাকথিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' গ্রন্থের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বিরূপ—এমন কথা বলা যায় না। আসলে ইতিহাস বলতে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু রাজাদের নাম ও যুদ্ধের তালিকা বোঝেন না, 'সামাজিক ইতিহাস'কে তিনি যথার্থ ইতিহাস বিবেচনা করেন বলেই তাঁকে বলতে হয়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার [পর] পীড়কদের জীবনচরিতমাত্র।"[৩১] রবীন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে অনেকটা একই ভঙ্গিতে প্রশ্ন তোলেন, "আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাস-পাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব?"[৩২] এবং সেই সঙ্গে মন্তব্য করেন, "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়িয়া থাকি তাহা রাজাদের জীবনবৃত্তান্ত, দেশের ইতিবৃত্ত নহে।"[৩৩] এবং "মামুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্যগর্বোদগার-কাল পর্যন্ত যে কিছু ইতিহাসকথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র।"[৩৪] ভারতবর্ষের ইতিহাস তথা সামাজিক ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ধারণা স্বতন্ত্র হলেও, লক্ষণীয় যে, দুজনেই রাজবৃত্তকে যথার্থ ইতিহাস বলতে রাজি নন।

তবে উনিশ শতকে বাংলা দেশের সামগ্রিক ইতিহাস লেখা নানা কারণেই সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিকদের মধ্যে সে সময়ে সামাজিক ইতিহাসের কথা ভেবেছেনই বা কজন? বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ একটি ধারণা পোষণ করতেন, যার পরিচয় তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া যায়। সমাজের অবস্থান্তরের স্বরূপ ও কারণ তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়। রাজকৃষ্ণকে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের দিকে তাকিয়ে বালকদের জন্য বই লিখতে হয়েছে। ফলে তাঁর পক্ষে

'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'কে পুরোপুরি সামাজিক ইতিহাসে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। সাহেবদের লেখা ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনেই তিনি পাঠান-মোগল যুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত বাংলার শাসকদের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে 'মন্তব্য' বা 'দেশের অবস্থা' শিরোনামে তিনি শুধু স্বাধীনভাবে ঘটনা পর্যালোচনা করেন নি, জমিদার-রায়ত, গ্রন্থকার, জ্ঞানচর্চা, ভাষা ও সমাজসংস্কার, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের খসড়া বললে ভুল হয় না।

'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাস 'কোথায় কোন্ পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে' তাব ইঙ্গিত দিয়েছেন। 'বাঙ্গালি জাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল'—এই একটি মাত্র সমস্যা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে আলোচনা করেছেন 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' প্রবন্ধে, এবং সেখানে তাঁর সিদ্ধান্তবাক্যটি সে কালের পক্ষে বিস্ময়কর বিবেচিত হতে পারে—"বাঙ্গালি অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে।...প্রথম কোলবংশীয় অনার্য্য, তারপর দ্রাবিড় বংশীয় অনার্য্য ; তারপর আর্য্য ; এই তিনে মিশিয়া আধুনিক বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।"৩৫ 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে অন্যান্য যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সেগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ তিনি পান নি। কিন্তু 'বাঙ্গালির উৎপত্তি' প্রবন্ধ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করলে যথার্থ ইতিহাস লিখতে পারতেন। ইতিহাসের তত্ত্বদর্শন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো আলোচনা করেন নি সত্য, কিন্তু ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্য থেকেই আমরা তাঁর ইতিহাসধারণা তথা ইতিহাসভাবনার পরিচয় পাই।

আকাদেমি পত্রিকা : ২, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, বৈশাখ ১৩৯৬।

১. তুলনীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যিনি প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসচর্চায় সমগ্র জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু এন. এন. ঘোষ সংগত কারণেই মন্তব্য করেন, 'Rajendra Lala Mitra also had not Bankim's penetration into human character and social problems, but his powers were more voluminous and varied, his reading was larger, his work in life more useful. His special gift lay in the interpretation of the past and the reading, sifting and weighing of historical evidence. His literary work, threfore, has been of an exceptionally high order, more fit to receive the appreciation of scholars than of the people. But he lacked Bankim Chandra's philosophical capacity and we are sorry, no less for the man than for the country, that Bankim Babu's philosophical work should have been left in an unshaped, embryonic form." সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, [১৯২১], পরিশিষ্ট পৃ. ৭।

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ৫২৪।

৩. ***Hundred years of the University of Calcutta : a history of the University***, 1957. p. 64.

৪. Bankim Chandra Chatterjee, ***Essays and Letters***, 1940. p. 200

৫. দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২২), ১৩৬১, পৃ. ৯৬।

৫ক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ', বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯২।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ-প্রবন্ধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৮০, পৃ. ১৬৬।

৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭, পৃ. ৩৬৬।

৮. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব : প্রথমখণ্ড, ১৯৮০, পৃ. ০।

৯. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালির বাহুবল', শ্রাবণ ১২৮১, পৃ. ১৫৪।

১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মানসবিকাশ', বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৪০৩।

১১. অতুলচন্দ্র গুপ্ত বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের এই দিকটি সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন, কিন্তু আধুনিককালেও এই রীতির অনুশীলন একেবারে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয় নি। দ্র. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাসের মুক্তি, ১৯৫৭, পৃ. ৬১-৭১।

১২. 'বাঙ্গালির বাহুবল', পৃ. ১৪৬।

১৩. একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হয়েছে হিন্দু-উৎসবের আলোচনা, যেখানে তিনি বলেন, "In the whole range of Hindu festivals, I have been unable to trace any to a historical origin. Indeed, historical festivals can scarcely be expected to be found among a nation devoid of historical associations." *Essays and Letters*, p. 8.

১৪. The Study of Hindu Philosophy, *Essays and Letters*, p. 77.

১৫. 'সাংখ্যদর্শন', বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৭৯, পৃ. ৪৬৪-৬৫।

১৬. 'ভারত-কলঙ্ক', বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯, পৃ. ১৪।

১৭. 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ,' বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ. ৭১।

১৮. অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ইতিহাসের মুক্তি, পৃ. ৪৪।

১৯. O. R. Collingwood, *The Idea of History*, 1946. Karl Popper, *The Poverty of Historicism*, 1957. E. H. Carr, *What is History*, 1962.

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রামায়ণ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৭, পৃ. ৫০৩।

২১. 'কমলাকান্তের দপ্তর : একটি গীত', বঙ্গদর্শন, ফাল্গুন ১২৮১, পৃ. ৪৮৬-৮৭।

২২. 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ : কামরূপ-রঙ্গপুর', বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, পৃ. ৭১-৭২।

২৩. তদেব, পৃ. ৭৫।

২৪. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৫০।

২৫. রাজকৃষ্ণের 'নানা প্রবন্ধ' গ্রন্থে অবশ্য ঐতিহাসিক বিষয়াবলম্বনে লেখা অনেকগুলি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ১৩৪০।

২৬. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৫০।

২৭. 'ঐতিহাসিক ভ্রম', বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১, পৃ. ২২৯।

২৮. 'বাঙ্গালার ইতিহাস', বঙ্গদর্শন, মাঘ ১২৮১, পৃ. ৪৫১-৫২।

২৯. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র', নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২, পৃ. ৫৯৮।

৩০. 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৭, পৃ. ৩৬৩।

৩১. তদেব, পৃ. ৩৬৫।

৩২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' (১৩০৫), ইতিহাস, ১৩৬২, পৃ. ১১৮।

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' (১৩১৫), ইতিহাস, পৃ. ৫৬।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৩০৯), ইতিহাস, পৃ. ৩।

৩৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালির উৎপত্তি', জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮, পৃ. ৬৭-৬৮।



বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তা

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের অল্পদিন আগে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি এবং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'পত্রসূচনা' থেকে মনে হয়, পত্রিকা প্রকাশকালে সাহিত্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সামাজিক প্রয়োজন সাধনের তাগিদ ছিল বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র কতটা প্রগতিশীল, কিংবা কত বেশি প্রতিক্রিয়াশীল তা নিয়ে আজও আমরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারি নি, কিন্তু তিনি যে সামাজিক সমস্যা নিয়ে আজীবন ভাবনাচিন্তা করেছেন সে বিষয়ে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তো বটেই, এমন কি উপন্যাসেও তাঁর সমাজচিন্তার পরিচয় মেলে। তবে উপন্যাসের কোনো চরিত্রের আচরণ বা উক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানধারণার নিদর্শন বলে গ্রহণ করার প্রবণতা বিপজ্জনক, যদিও অনেকে সেইভাবেই দেবেন্দ্র বা তারাচরণকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূ, সূর্যমুখীকে বিদ্যাসাগর-বিরোধী বা কুন্দনন্দিনীর আত্মহত্যাকে বিধবাবিবাহের অনিবার্য পরিণাম ভেবেছেন। উপন্যাসের চরিত্র-পরিকল্পনায় লেখকের রুচি ও সংস্কার কাজ করতে পারে, কিন্তু চরিত্রের কার্যকলাপ সব সময় লেখকের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করে এমন কথা ভাবলে ভুল হবে। চরিত্র নিজের নিয়মে অগ্রসর হয়। আর বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত চরিত্রের মুখ দিয়ে নিজে কথা বলেন না। একমাত্র কমলাকান্তকে এর ব্যতিক্রম বলা যায়, কিন্তু সেখানে উপন্যাস-রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার পরিচয় আমরা সন্ধান করবো তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে, কারণ সেখানে তাঁর বক্তব্যের ভাষা প্রত্যক্ষ, এবং অধিকাংশ সময় অদ্ব্যর্থ। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বাংলা প্রবন্ধের সন্ধান মেলে না। সেদিক থেকে

'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনা' বঙ্কিমমানসের পরিচয়গ্রহণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে—

১. আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিনকোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিব না।...নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালি স্পৃহণীয়।

২. এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন 'ফিল্‌টর ডৌন্' করিবে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগের পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই ; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে।...আমাদিগের দেশের লোকের এই জলময় বিদ্যা যে এতদূর গড়াইবে, এমন ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে।

৩. প্রধান কথা এই যে, এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন-শ্রেণীর লোকের মধ্য পরস্পর সহৃদয়তা কিছুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ, দরিদ্রেরা, ধনবান্ এবং কৃতবিদ্যদিগের কোন সুখে সুখী নহে।...প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণগত পার্থক্য। এই বর্ণগত পার্থক্যের কারণ, উচ্চ বর্ণ ও নীচ বর্ণে যেরূপ গুরুতর ভেদ জন্মিয়াছিল, এমত কোন দেশে জন্মে নাই, এবং এত অনিষ্টও কোন দেশে হয় নাই। সে সকল অমঙ্গলের সবিস্তার বর্ণনা এখানে করার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে বর্ণগত পার্থক্যের অনেক লাঘব হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা এবং সম্পত্তির প্রভেদে অন্যতর বিশেষ পার্থক্য জন্মিতেছে। (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯)

এখানে যে-প্রসঙ্গগুলির অবতারণা করা হয়েছে, উনিশ শতকের শেষপাদে এগুলি আমাদের প্রধান সামাজিক সমস্যা বলে পরিগণিত হতো। রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এ কাল' বইয়ের আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যদিও জানিয়েছেন, 'অনুকরণ

মাত্র ঘৃণ্য নহে, এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে।' কিন্তু সেই-সঙ্গে তিনি রচনা করেন 'হনূমদ্বাবুসংবাদ' এবং 'কনফেসনস অফ এ ইয়ং বেঙ্গল'। ইংরেজি ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের ভালোই অধিকার ছিল, শম্ভুচন্দ্রকে লেখা চিঠি থেকে মনে হয় ইংরেজিতে গল্প, কবিতা থেকে শুরু করে সব ধরনের রচনাতেই তিনি সমান দক্ষ, এবং মনে মনে সেজন্য বেশ একটু গর্ব অনুভব করতেন তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জানতেন, যত ভাল ইংরেজি লিখতে ও বলতে সক্ষম হোন, তাঁর পক্ষে ইংরেজ হওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে তিনি মানতেন, "উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণপ্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।" (বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮১)। অথচ উনিশ শতকের সত্তরের দশকেও শহরে শিক্ষিত বাঙালির সাহেব সাজার শখ কমে নি। রাজনারায়ণ বসুর সতর্কবাণী বঙ্কিমচন্দ্রের কেন ভাল লেগেছিল তা সহজেই বুঝতে পারি—হয়তো একে ঘরে ফেরার ডাক বলা যেতে পারে, কিন্তু সেইজন্য হিন্দুজাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার সঙ্গে রাজনারায়ণ বা বঙ্কিমকে এক করে দেখা ঠিক হবে না। বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্রসূচনা'তেই জানিয়েছেন, "আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান।...যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না।" কেন চলবে না? বাস্তবে তা সম্ভব নয় বলেও চলবে না, কিন্তু তার থেকে বড় কারণ তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত ইংরেজি ভাবাপন্ন মানুষের বিচ্ছেদ ঘটবে। বলাবাহুল্য উনিশ শতকে খুব কম ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই বিচ্ছেদ তথা বিভেদের কথা ভেবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের স্নাতক, আর সেই সুবাদে সরকারি উচ্চপদের অধিকারী। মধ্যবিত্ত স্বার্থের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। 'লর্ড রিপনের

উৎসবের জমা-খরচ'-এর হিসাব নিতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে, "আমাদের চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ ;—সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল।...এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ এবং উন্নতির সোপান।" (প্রচার, পৌষ ১২৯১) কিন্তু তিনি জানতেন সরকারি শিক্ষানীতির ফলে উচ্চশিক্ষার সবটুকু সুযোগ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অল্প কয়েকজন ভোগ করছেন, আর তথাকথিত 'ফিলট্রেশন থিওরি'র নামে অধিকাংশজনকে বঞ্চিত করে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা কখনও সমর্থনীয় নয়। 'সর উইলিয়ম গ্রে ও সর জর্জ কাম্বেল'-এর শাসনকালের আলোচনায় ক্যাম্বেলের শিক্ষানীতির সমর্থনে তিনি লেখেন, "উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহার [ক্যাম্বেলের] আর একটি নিন্দার কারণ। যিনি কোন প্রকার শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি মনুষ্যজাতির শত্রুর মধ্যে গণ্য। তবে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে, সকল মনুষ্যেরই শিক্ষায় সমান অধিকার। শিক্ষায় ধনীর পুত্রের যে অধিকার, কৃষকপুত্রের সেই অধিকার। রাজকোষ হইতে ধনীদিগের শিক্ষার জন্য অধিক অর্থব্যয় হউক, নির্ধনদিগের শিক্ষায় অল্প ব্যয় হউক, ইহা ন্যায়বিগর্হিত কথা। বরং নির্ধনদিগের শিক্ষার্থ অধিক ব্যয়, এবং ধনীদিগের শিক্ষার্থ অল্প ব্যয়ই ন্যায়সঙ্গত ; কেন না ধনিগণ আপন ব্যয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নির্ধনগণ, সংখ্যায় অধিক, এবং রাজকোষ ভিন্ন অনন্যগতি। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপর শিক্ষার্থ যে প্রণালীতে ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন তাহা ন্যায়ানুমোদিত নহে। ধনীর শিক্ষার্থই সে ব্যয় হইয়া আসিতেছে ; দরিদ্রের শিক্ষার্থ প্রায় নহে।...যদি উচ্চশিক্ষার ব্যয় হইতে, কিছু টাকা লইয়া তাহা দরিদ্র শিক্ষায় ব্যয় করিবার জন্য সর জর্জ কাম্বেল উচ্চশিক্ষার ব্যয় কমাইয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহার নিন্দা করিতে পারি না।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, আধুনিককালে যাঁদের 'ভদ্রলোক' বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাঁদের

পক্ষে উচ্চশিক্ষার বিরোধিতা করা সে সময় খুব স্বাভাবিক মনে করা যায় না। বিশেষত ইংরেজ শাসনের তথাকথিত 'সুফল' ভোগী ভদ্রলোকদের পক্ষে শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হওয়া অসংগত নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যুগগত কারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেও তাঁর স্বাভাবিক কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে আধুনিক শিক্ষিত মানুষের স্বার্থপরতাজনিত বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্বন্ধে সচেতন করেছে। দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, সেখানে ইংরেজি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগিতা কতখানি? ১৮৭২ সালেই বঙ্কিম 'কনফেসন্‌স অফ এ ইয়ং বেঙ্গল' প্রবন্ধে লেখেন।

You are bringing into fashion a habit of heartless isolation which, very unlike your highly volatile 'High Education,' is steadily filtering into the inferior strata of the community. Fostering independence, forsooth! Do not lay that flattering unction to your soul. Your interest and your duty are so happily in unision in this same matter of fostering independence of character in your poor relations that you ought really to pause and consider what you are about. One thing is quite clear : this zeal for the formation of a national habit of self-reliance never shows itself, except in the sunshine of comparative prosperity.

বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার মূল সূত্র, তাঁর নিজের ভাষায়, 'সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।' 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পিছনেও এই একই উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। শিক্ষা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিশিক্ষা বোঝেন না, কারণ ইংরেজিশিক্ষিত ভদ্রলোক 'সুশিক্ষিত' হতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে "শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক্ রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউল্‌কারি সুসিদ্ধ

হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্দ্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট্ সাহেব, এ দেশে সার অ্যাস্‌লি ইডেন, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ'—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাটলক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।" (লোকশিক্ষা, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮৫)। তাহলে বাংলা ভাষার মাধ্যমে লোকশিক্ষার প্রসার একান্ত কাম্য। সেকালের ইংরেজিনবীশদের সঙ্গে এইখানে বঙ্কিমের বিরোধ—তাঁর মতে "ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।'

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনও 'ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক' বলা চলে না। তাঁর সমাজচিন্তায় জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২), জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩) এবং অগুস্ত কোঁতের (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রভাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। মিলকে তিনি 'পরম আত্মীয়' মনে করতেন। লোকশিক্ষার ধারণা তিনি মিলের কাছ থেকে পেয়েছেন এমন মনে করার কারণ নেই, কিন্তু 'বিদ্যানুশীলন বিষয়ে তিনি [মিল] যে পথ প্রদর্শন' করেছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র ঐক্যমত,—"মিল বলিয়াছেন যে, যেমন চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ নিবারণের উপায় রাজা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপ তাবৎ লোককে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়াও রাজার কর্ত্তব্য। তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে উত্তম অধম, ধনী দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিবে; সর্ব্বত্র বিজ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইবে এবং ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে।" (জন

ষ্টুয়ার্ট মিল, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১২৮০)। মিলের প্রিন্সিপিলস অফ পলিটিক্যাল ইকনমি, এসেজ অন লিবার্টি, সাবজেকশন অফ উওমেন প্রভৃতি বইগুলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল,—তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থের প্রধান ভিত্তি জন স্টুয়ার্ট মিল বললে হয়ত ভুল হবে না। তবে 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' (১৮৬২) বইটি সে কালে আরও অনেক সমাজহিতৈষীর মতো বঙ্কিমকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। বেন্থাম হিতবাদের প্রধান প্রবক্তা হলেও মিলের রচনার মধ্য দিয়ে হিতবাদ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র যদিও শেষজীবনে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন, 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।' কিন্তু মিলের কোনো কোনো মত পরিত্যাগ করলেও বঙ্কিমের সমাজচিন্তায় হিতবাদ কখনও পরিত্যক্ত হয় নি। পরিণত বয়সে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রচনাকালেও বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে শুনি, "হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।" আসলে যৌবনে প্রচারিত বঙ্কিমের 'প্রীতিতত্ত্ব' হিতবাদের নামান্তর হলেও, তখন থেকেই মিল-বেন্থামের হিতবাদ সম্বন্ধে তাঁর কিছু আপত্তিবোধের পরিচয় পাই। 'কমলকান্তের দপ্তরে' তিনি হিতবাদকে 'উদর-দর্শন' নামে অভিহিত করেছেন। 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন, বস্তুতঃ "সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" ('জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্তের সমালোচনা: প্রথমভাগ-মনুষ্যত্ব কি?', বঙ্গদর্শন,

আশ্বিন ১২৮৪)। এই উদ্দেশ্যমাত্র অবলম্বন করে যাঁরা জীবন কাটিয়েছেন তাঁদের স্বলিখিত জীবন-বৃত্ত মানুষের অমূল্য শিক্ষাস্থল, দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্কিম উল্লেখ করেছেন জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী। সেই সঙ্গে 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধের পাদটীকায় তাঁকে লিখতে হয়েছে, "স্বীকার করি, কিয়ৎ-পরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গলজনক এ কথা বলি না, ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।" কিন্তু উনিশ শতকে হিতবাদের প্রবক্তারা সামাজিক ধনবৃদ্ধির উপর বড়ো বেশি জোর দিয়েছিলেন, ফলে 'গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস অফ দি গ্রেটেস্ট নম্বার' কথাটি শুনতে ভালো লাগলেও প্রথমত সেখানে 'সকলে'র কথা বলা হয় না, দ্বিতীয়ত মানুষের কিসে 'সুখ' সে সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা প্রকাশ পায় না। ফলে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ বঙ্কিম কখনও অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলেন, "তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না?" আবার কখনও সেই কথাই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে মর্মভেদী হয়ে ওঠে, "হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্র সকল ঢাকঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদপত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি।…আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র

বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন কামার! পাঁটা হাঁড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের নাম করিয়া এক কোপে পাচার কর।" (আমার মন)।

'ইউটিলিটেরিয়েন কামার'-বেন্থাম মানুষের যাবতীয় কর্মপ্রয়াসের পিছনে দেখেছেন ব্যক্তিস্বার্থের প্রণোদনা। অর্থাৎ বেন্থামের মতে মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গঠনের সময় এই স্বার্থচিন্তার যে সদ্ব্যবহারের কথা বেন্থামপন্থীরা বলেন, মিল তার সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। অন্যদিকে উপযোগিতাবাদের ক্ষেত্রেও মিলের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লক্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' নাটক আলোচনাকালে জানিয়েছেন, "বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুষ্পিন' খেলার একই দর।" কিন্তু তারপর মিলের অনুসরণে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, "চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে।" তা না হলে শতরঞ্চ খেলা ফেলে কেউ শকুন্তলা পড়তো না। বেন্থাম থেকে মিল অনেক দূরে সরে এসেছেন, তার প্রমাণ, মিল বলবেন, "I regard utility as the ultimate appeal…but it must be utility in the largest sense, grounded on the permanent interest of a man as a progressive being."

অবশ্য মিলের প্রগতির ধারণার সঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতির ধারণা মেলে না। গড্‌উইনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মিল মনে করেছিলেন, পৃথিবীতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রতিভাবান মানুষই প্রতিভার ধারক ও বাহক—সমাজ এদের উপর নির্ভর করে—সুতরাং ব্যক্তিস্বাধীনতা সমাজবিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। আসলে মিলের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উনিশ শতকী ইংলণ্ডে প্রশ্রয় পেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বেশি দূর পর্যন্ত গ্রহণীয় ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, "মনুষ্য শক্তির আধার। সমাজ মনুষ্যের সমবায়, সুতরাং সমাজও শক্তির আধার। সে শক্তির বিহিত প্রয়োগে মনুষ্যের মঙ্গল—দৈনন্দিন সামাজিক উন্নতি। অবিহিত

প্রয়োগে, সামাজিক দুঃখ। সামাজিক শক্তির সেই অবিহিত প্রয়োগ, সামাজিক অত্যাচার।" (বাহুবল ও বাক্যবল, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪)। তিনি রুশোর বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত অনুসরণে এই সূত্রে লেখেন, "অসামাজিক অবস্থায় কেহই দরিদ্র নহে—বনের ফলমূল, বনের পশু, সকলেরই প্রাপ্য ; নদীর জল, বৃক্ষের ছায়া সকলেরই ভোগ্য। আহার্য্য, পেয়, আশ্রয়, শরীরধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অধিক কেহ কামনা করে না, কেহ আবশ্যকীয় বিবেচনা করে না, কেহ সংগ্রহ করে না। অতএব একের অপেক্ষা অন্যে ধনী নহে, একের অপেক্ষা অন্যে কাজে কাজেই দরিদ্র নহে। কাজে কাজেই অসামাজিক অবস্থা দারিদ্র্যশূন্য। দারিদ্র্য তারতম্যঘটিত কথা ; সে তারতম্য সামাজিকতার নিত্য ফল। দারিদ্র্য সামাজিকতার নিত্য কুফল।" বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে স্বীকার করলেও সামাজিকতার সমালোচনা করেন। কারণ 'সামাজিকতা' তথা ধনবণ্টনে তারতম্য মানুষেরই সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের যে ধারণা পোষণ করতেন, তার পিছনে কাজ করেছে রুশো, ওয়েন, লুই ব্লাং এবং কাবের অর্থনৈতিক চিন্তা। দারিদ্র্যের কারণ এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় নির্দেশে এই বিচারবিশ্লেষণকে বৈজ্ঞানিক বলা না গেলেও সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে মিল সাম্যবাদ সম্বন্ধে মৌলিক আপত্তি তুলেছেন, "We have only further to suppose a considerable diffusion of Socialist opinions, and it may become infamous in the eyes of the majority to possess more property than some, very small amount or any income earned by manual labour."

সাম্য' গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন,

[এক] কৃষকের কথা যে আধুনিক সামাজিক বৈষম্যের উদাহরণ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে, এমত নহে। প্রাচীন বর্ণ-বৈষম্যের ফলস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পাঠক যেন এই কথাটি স্মরণ রাখেন।

[দুই] সাম্যনীতি নূতন তত্ত্ব নহে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা যে ভাবে ইহার বিচার করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াছি—সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত প্রভেদ দেখিলে কেহ রাগ করিবেন না।

কিন্তু আমরা দেখব 'সাম্য' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষাংশে ভারতবর্ষে কৃষকের তথা শ্রমোপজীবীর দুরবস্থার 'একটি মূল কারণ' হিসাবে বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ করা হলেও, বর্ণবৈষম্যের ফল প্রদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মনে হয় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সাম্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি লেখার সময় তিনি অসাম্যের কারণ হিসাবে সামাজিক ও প্রাকৃতিক কারণের কথাই বেশি ভেবেছিলেন, পরে গ্রন্থ প্রকাশকালে বর্ণবৈষম্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

তবে বর্ণবৈষম্য তথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে 'সাম্য' গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে যে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী বঙ্কিমচন্দ্রকেই দেখতে পাব, "পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখন কোন সমাজে প্রচলিত হয় নাই।...এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল।" (বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)। পরবর্তীকালে সমাজে বর্ণভেদের কারণ এবং উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণের ভূমিকা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যমত পোষণ করেছেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণদের 'ঊর্ণনাভের জালে'র বর্ণনাকালে পাদটীকায় তিনি মন্তব্য করেন, "টাকাটার উল্টা পিঠ আমি ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছি। উভয় মতই সত্যমূলক।" 'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার কোন গুণে নহে অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না; মনে থাকে যেন যে, সেও তোমার ভাই—তোমার

সমকক্ষ। যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধি ধারণ করেন, তাঁহারও যেন স্মরণ থাকে যে, বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মণ্ডল তাঁহার সমকক্ষ, এবং তাঁহার ভ্রাতা। জন্ম, দোষগুণের অধীন নহে। তাহার অন্য কোনো দোষ নাই। যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন, পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।" (আষাঢ় ১২৮০)। এখানে 'ন্যায়বিরুদ্ধ আইনের দোষে পিতৃসম্পত্তি' লাভের বর্ণনায় মিলের অনুরূপ বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। অন্যদিকে ধনবণ্টনের বৈষম্যকে এখানে দারিদ্র্যের কারণ বলা হলেও 'ধর্ম্মতত্ত্বে' তা অস্বীকার করা হয়েছে,—

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে!

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্ম্মের ভোগ?

গুরু। অবশ্য।

শিষ্য। কোন্ অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য?

গুরু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

অন্যদিকে ভূমিকায় যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিপাদিত সাম্যনীতির সঙ্গে ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের প্রভেদের কথা বলছেন, কিন্তু কার্যত তিনি ইউরোপীয় সাম্যবাদী সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত গ্রহণ করেছেন। প্রভেদ কোথাও নেই তা নয়, যেমন বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট এবং রুশোকে তিনি 'সাম্যাবতার' হিসাবে একই 'মহামন্ত্রে'র প্রচারক বলে নির্দেশ করেছেন,—তাঁদের 'উপদেশে'র মধ্যে সাম্য-দর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বিচার। বলাবাহুল্য, এ বিচারের মধ্যে যে ত্রুটি নিহিত

ছিল, পরে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত হয়েছেন। তবে সব মিলিয়ে 'সাম্য' গ্রন্থটি অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মনীষীদের মতামতের সংকলন, এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার সন্ধান করে লাভ নেই। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'শারীরিক ও মানসিক শক্তির' তথা বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের কথা বলেন তখন নিজেই তিনি তাকে 'ডাকট্রিন অফ কালচারের' সঙ্গে তুলনা করেন। 'দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রমে'র মধ্যে বিলাতি অনুশীলনবাদীদের 'সিসটেম অফ কালচার'-সন্ধান কৌতুককর মনে হলেও, স্পষ্টই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কোঁতের সমাজতত্ত্বের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসের সূচনায় তিনি কোঁতের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, "The General Law of Man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more religious." (*Catechism of Positive Religion*) আমাদের মনে পড়বে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থে অনুশীলন তত্ত্ব ব্যাখ্যাকালে পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানান, "লেখক-প্রণীত দেবীচৌধুরাণী নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ-স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে।" তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ কোঁতপন্থী বা ধ্রুববাদী বলা যায় কি না সন্দেহ। কোঁত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর যতটা জোর দিয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তা দেন নি। পার্থিব জ্ঞানের জন্য পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হওয়া কাম্য, এবং সে জন্য কোঁতের গ্রন্থাবলী বঙ্কিম অবশ্যপাঠ্য বিবেচনা করেছেন। 'ধর্ম্মতত্ত্বে'র গুরু জানিয়েছেন, বহির্বিজ্ঞানে "অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এইজ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে।···কোমতের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকটে যাচ্ঞা করিবে।" কিন্তু ঈশ্বরকে জানার জন্য হিন্দুশাস্ত্রই প্রধান অবলম্বন। ইউরোপে মানবপ্রীতির ধারণা হিতবাদীদের রচনায়,

কোঁতের 'হিউম্যানিটি-পূজা' এবং খ্রীষ্টের 'জাগতিক প্রীতিবাদে' প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে স্মরণীয় যে, লোকবাৎসল্য সেখানে অধিকাংশ সময়ে দেশবাৎসল্যে পরিণত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ ১২৭৯) 'কোম্‌ৎ দর্শন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফর্বেসের মতো কেউ কেউ প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে গ্রহণ করলেও, এ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। তবে প্রবন্ধকার যে পত্রিকা-সম্পাদকের অনুমোদন ও সমর্থন লাভ করেছিলেন এমন মনে করলে ভুল হবে না। 'কোম্‌ৎ দর্শন' প্রবন্ধে উপস্থাপিত কোঁতের কয়েকটি ধারণা বা সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় শুনতে পাই যেমন, 'পরোপকারার্থে জীবন ধারণ।' 'বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি ও স্নেহ আমাদের উন্নতির এক প্রধান সোপান।' 'বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দাসী, কিন্তু তাহার বন্দিনী নহে।' 'আপনার সুখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই পুরুষার্থ।' একমাত্র কোঁতের নিরীশ্বরতার ধারণা ('দৈববলে বিশ্বাসের ক্রমে হ্রাস হইতেছে, আরও হইবে।…পরিশেষে ঐ বিশ্বাস একেবারে অন্তর্হিত হইবে।') বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গ্রহণীয় মনে হয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলেছেন, 'পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।' (আমার মন)। 'সাম্য' গ্রন্থে বঙ্কিমের মুখে শুনি, "অস্মদ্দেশে স্ত্রী-পুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে।" 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার রহিতকালে সমাজে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রচনাকালেও তাঁর মনে হয়েছে, "হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তিপাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মর অপেক্ষা কোমত ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও

স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র ; যাঁহারা ইহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র।" এখানে যেটুকু মত-পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাকে মিল থেকে ক্রমশ কোঁতের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিদর্শন বলতে পারি। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় কোঁতের উল্লেখ বেশি দেখা যায় এবং কখনও কখনও তিনি ধ্রুববাদী দর্শনের মূল সূত্রগুলি শুধু তাঁর ধর্মতত্ত্বে গ্রহণ করেছেন তাই নয়, তার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনেও তৎপর হয়েছে যেমন—

১. শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সহিত যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শ দোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি ?

২. গুরু। যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগুস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত করিব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; কেন না, কোম্‌ত নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপিত করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, Religion, in itself expresses the state, of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's exitence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose. অর্থাৎ Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the seperate individuals. যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার যোগ প্রথমে খুব স্পষ্ট মনে না হতে পারে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতো কারো কারো এমনও মনে হয়েছে, "বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার মোহবন্ধন সম্পূর্ণ কাটাইয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না ; কিন্তু প্রচারের পশ্চাতে যে বঙ্কিমচন্দ্র দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে রাহুগ্রাসমুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মত দীপ্তিমান দেখি।" বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার পরিচয় 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের রচনাতেই সন্ধান করা হয়, এবং সেদিক থেকে তার মধ্যে 'পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহবন্ধন' দেখতে পাওয়া অসম্ভব নয়। অন্যদিকে 'প্রচার'-পর্বের রচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ব্যস্ত, এবং তাঁর ধর্মচিন্তা 'রাহুগ্রাসমুক্ত'। কিন্তু 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র যখন লেখেন "অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?' 'লইয়া কি করিতে হয় ?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।" তখন বুঝতে পারি, বঙ্কিমমানসের পরিণতিধারা অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনাকে 'পাশ্চাত্য' ও প্রাচ্য' দুই ভাগে ভাগ করা নিষ্প্রয়োজন। আমরা কয়েকটি প্রসঙ্গ অবলম্বনে বঙ্কিমের সমাজচিন্তার অপরিবর্তনীয় দিকগুলি নির্দেশ করতে চাই।

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবন চিন্তাভাবনা করেছেন। 'লোকরহস্য' কিংবা 'কমলাকান্তে', এমনকি 'বিবিধ প্রবন্ধে'ও একাধিক রচনায় তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষার পরিণাম সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছেন, যেমন [বাঙালি] "বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে।" (অনুকরণ)। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রায় এই একই কথা একই ভঙ্গিতে পুনরুক্ত হতে দেখি,—"মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধপিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে,

কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গদ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় —বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব যে সমাজতত্ত্ব থেকে কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তা বুঝে নেওয়ার দরকার আছে। ধর্মে এবং সমাজে সর্বত্রই শেষ কথা মনুষ্যত্ব অর্জন। মনুষ্যত্ব অর্জনের উপায় নির্দেশকালে বঙ্কিমচন্দ্র একদা বলেছিলেন, কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য, জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলিরও সেইরূপ অনুশীলন জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। "বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।" (মনুষ্যত্ব কি)। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' এই একই কথা বলা হয়েছে, শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা,—"কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতির ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্বতত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়।...প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালিরা অমানুষ হইতেছে ; তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালির চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে।" তাহলে বঙ্কিমের আসল চিন্তার বিষয়, মনুষ্যত্ব অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা, এবং সেখানে তিনি আধুনিক বিশেষজ্ঞতা বা স্পেশালাইজেশনের নঞর্থক দিকটি পরিস্ফুট করেছেন, "আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে,

সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক; তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, সে কাব্যরসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদত্তপ্রাণ, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্ম্মে পতিত।" এখানে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পূর্ণ মানবতার আদর্শ তথা *Uomo Universale*-এর ধারণা কি ভাবে উনিশ শতকী বঙ্গীয় নবজাগরণকে উদ্বুদ্ধ করে, তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে 'শক্তির আধার' বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ চালিত স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা সামাজিক কল্যাণসাধনের সংকল্প—'কমলাকান্ত' ও 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়েছে। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' কিছুটা আকস্মিক ভাবেই ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাকালে সমাজ-ভক্তির কথা এসেছে, "সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া অগুস্ত কোম্‌ত 'মানবদেবী'র পূজার বিধান করিয়াছেন।" কিন্তু সমাজকে কি সব সময়ে 'ভক্তি' করা সম্ভব বা উচিত? সমাজের সঙ্গে যেখানে ব্যক্তির বিরোধ দেখা যায়, সেখানে সমাজের কাছে ব্যক্তির আত্মসমর্পণ সব সময় কাম্য হতে পারে না। যেমন হিন্দুসমাজে "ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন।" কিন্তু উনিশ শতকের ভারতবর্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই সঙ্গে বলতে হয়েছে, "যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্,

নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব ; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।"

অনুরূপভাবে 'রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে' বলা সত্ত্বেও সেই সঙ্গে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে, "রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য।" এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে নতুন সমাজতত্ত্ব রচনা করতে হয়েছে এবং তাঁর ধর্মতত্ত্ব যে আত্যন্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম থেকে স্বতন্ত্র তা বোঝাবার জন্য তাঁকে অনেক বাক্যব্যয় করতে হয়েছে—"হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের 'বখামি'গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।"

উনিশ শতকে সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধ নিয়ে সে সময়ে প্রভূত উত্তেজনা দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (আষাঢ় ১২৮০) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তকে'র সমালোচনাকালে এমন কিছু কথা বলেন, যা থেকে তাঁকে বিদ্যাসাগরবিরোধী তথা বিধবাবিবাহবিরোধী ও বহুবিবাহসমর্থক মনে করা হয়। কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত 'সাম্য' গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে অদ্ব্যর্থ ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে, "বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে ; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।···যদি কোনো বিধবা হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।" বিধবাবিবাহ-আইন থাকা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহের

'নৈতিক তত্ত্ব' সমাজে স্বীকৃতি লাভ না করায় তার ব্যাপক প্রচলন ঘটে নি; বঙ্কিমচন্দ্র-এর জন্য দায়ী করেছেন 'বিধানকর্তা পুরুষ'দের,—"তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ যে, এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বৈষম্য।" বিধবাবিবাহ-প্রসঙ্গের অনতিপরে বহু বিবাহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে আলোচনা করেছেন, এবং প্রবন্ধের পাদটীকায়-যুক্ত তাঁর সিদ্ধান্তবাক্যটিকে এ বিষয়ে তাঁর শেষ কথা মনে করা যেতে পারে,—"বস্তুতঃ বহুবিবাহ পক্ষে বলিবার দুই একটা কথা আছে, কিন্তু আমার বিবেচনায় বহুবিবাহ এমন কদর্য্য প্রথা যে, সে সকল কথার উল্লেখ মাত্রেও অনিষ্ট আছে।" 'বঙ্গদর্শনে' বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকার সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই আরও জোর দিয়ে বললেন, "বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, যিনি তাহার বিরোধী, তিনিই আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন।" কিন্তু তাঁর মনে হয়েছে বহুবিবাহের বিরোধিতাকালে "ধর্ম্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন দিকে কোন ফল নাই।" সুশিক্ষার ফলে বহুবিবাহপ্রথা ক্রমশ লুপ্ত হবে,—"বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি প্রজার হিতার্থ, আইনের আবশ্যকতা আছে, ইহা স্থির হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রের মুখ চাহিবার আবশ্যক নাই।"

জীবনের প্রান্তভাগে এসে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশকালে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও উপায় এইভাবে নির্দেশ করেন, "শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোনো কারণ আমি দেখি নাই!...আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা

বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না।" বিধবা-বিবাহের নৈতিক সমর্থন, বহুবিবাহের নিন্দা, সমুদ্রযাত্রাকে ধর্মানুমোদিত বলা—কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পিছুটানের লক্ষণ দেখি না। ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা যখন 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেন, তখন তার মধ্যেও যুক্তিবাদী বঙ্কিমের সমাজচেতনার পরিচয় মেলে। পৌত্তলিক মতের উপযোগিতা প্রদর্শনের জন্য 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধের রচয়িতা 'শ্রীঃ' কয়েকটি যুক্তি দেখান, বঙ্কিম কি ভাবে সেগুলি খণ্ডন করেছেন তা দেখা যাক,—

"তৃতীয় উপকার, তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ রোগ ভাল করেন, শ্রীঃ বলেন, রোগ বিশ্বাসে ভাল হয়, বিশ্বাস দেবতার উপর। যদি বিশ্বাসে রোগ ভাল হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িলেই দেবতারা পদচ্যুত হইতে পারেন। চতুর্থ উপকার, উৎসব, যথা দুর্গোৎসবাদি। জিজ্ঞাসা করি এই হতভাগ্য অন্নক্লিষ্ট, বৃথা হট্টগোলে ব্যতিব্যস্ত বঙ্গসমাজে এতটা উৎসবের কি প্রয়োজন আছে? এখন কতকগুলি কঠিনহৃদয়, ভোগপরাঙ্মুখ, উৎসববিরত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় না হইলে, ভারতবর্ষের কি উদ্ধার হইবে? পঞ্চম, শ্রীঃ বলেন এই উপধর্ম্ম বঙ্গের সমাজবন্ধন; এ বন্ধন রাখিয়া, সমাজ রক্ষা কর। বঙ্গসমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমাজ ভঙ্গ করা, বিচলিত, বিপ্লুত করারই প্রয়োজন হইয়াছে; এই খইয়ে বন্ধনে বাঙ্গালির প্রাণ গেল। এ পচা গোরুর দড়ি আর আমাদের গলায় রাখিও না। যদি দেবতা-পূজাই এই নরকতুল্য সমাজের মূল গ্রন্থি হয়, তবে আমি বলি, যে, শীঘ্র শাণিত ছুরিকার দ্বারা ইহা ছিন্ন কর। নূতন সমাজ পত্তন হউক।" (ভ্রমর, অগ্রহায়ণ ১২৮১)

'সাম্য' গ্রন্থে এই 'নূতন সমাজ পত্তনে'র আকাঙ্ক্ষা অন্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বঙ্গ দেশের কৃষক' প্রবন্ধের 'কিয়দংশ' 'সাম্য' গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার রহিত করলে, সমগ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তখন পুনর্মুদ্রণের সমর্থনে তিনি মন্তব্য করেন, "এক্ষণে যে আমি পুনর্মুদ্রিত করিতেছি, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। (১) ইহাতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল তাহা জানা যায়। ভবিষ্যৎ

ইতিহাসবেত্তার ইহা কার্য্যে লাগিতে পারে। (২) ইহার পর হইতে কৃষকদিগের অবস্থা সমাজে আন্দোলিত হইতে লাগিল। এক্ষণে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার প্রথম সূত্রপাত, সুতরাং পুনর্মুদ্রিত হইবার এ প্রবন্ধ একটু দাবি দাওয়া রাখে। (৩) ইহাতে কৃষকদিগের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এখনও অনেক প্রদেশে অপরিবর্ত্তিতই আছে। যতগুলি উৎপাতের কথা আছে, তাহা সব কোন স্থানেই এখনও অন্তর্হিত হয় নাই।" অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'অর্থশাস্ত্রঘটিত ইহাতে কয়েকটা কথা আছে, তাহা আমি এক্ষণে ভ্রান্তিশূন্য মনে করি না।' [যেমন, 'রাজকর্ম্মচারীদিগের জন্য এ দেশের কিছু ধন বিলাতে যায়, এবং তাহার বিনিময়ে আমরা কোন প্রকার ধন পাই না। কিন্তু সে সামান্য মাত্র।" —পাদটীকায় তিনি পরে মন্তব্য করেন, "এই কথাটাই বড় বেশী ভুল। এ সকল বিচারে ভুল আছে গোড়ায় স্বীকার করিয়াছি।"] কিন্তু 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই সংশয় প্রকাশ করেন নি, এবং সে দিক থেকে বঙ্কিমের সমাজচিন্তার আলোচনায় প্রবন্ধটির মূল্য অসামান্য। এখানে বঙ্কিম আর একবার বললেন, 'দেশের শ্রীবৃদ্ধি' 'অর্থাৎ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের 'শ্রীবৃদ্ধি'তে কখনও দেশের মঙ্গল হতে পারে না। তিনি দেখেছেন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ভেদ আরও বেড়েছে, তাই তাঁর প্রশ্ন—"বল দেখি চশমা-নাকে বাবু! ইহাদের কি মঙ্গল হইয়াছে? তুমি লেখাপড়া শিখিয়া ইহাদিগের কি মঙ্গল সাধিয়াছ?" বিদেশি শাসকের প্রতি তাঁর শ্লেষোক্তি আরও তীব্র,—"আর তুমি, ইংরাজ বাহাদুর! তুমি যে মেজের উপরে এক হাতে হংসপক্ষ ধরিয়া বিধির সৃষ্টি ফিরাইবার কল্পনা করিতেছ, আর অপর হস্তে ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুচ্ছ কণ্ডূয়িত করিতেছ—তুমি বল দেখি যে, তোমা হইতে এই হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে?" (এখানে লক্ষণীয়, কৃষিজীবী হাসিম শেখ এবং রামা কৈবর্ত্তের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয় নি। হিন্দু এবং মুসলমান, উভয়েই দেশের শ্রীবৃদ্ধির ফল থেকে বঞ্চিত। 'প্রচার' পত্রিকায় অনেকদিন পরে বঙ্কিম যখন 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি'

লেখেন, তখন সেখানেও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রকাশ তাঁর মধ্যে দেখা যায় না, বরং তাঁর কণ্ঠে শোনা গেছে "যে খ্রীষ্টিয়ান, কি মুসলমান মনুষ্যমাত্রকে আপনার মত দেখিতে শিখিয়াছে, সে যীশুরই পূজা করুক আর পীর প্যাগম্বরেরই পূজা করুক, সেই পরম বৈষ্ণব। আর তোমার কণ্ঠী কুঁড়োজালির নিরামিষের দলে, যাহারা তাহা শিখে নাই, তাহারা কেহই বৈষ্ণব নহে।...যখন সর্ব্বত্রসমান জ্ঞান, সকলকে আত্মবৎ জ্ঞানই বৈষ্ণবধর্ম্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান, এ ছোট জাতি ও বড় জাতি, এরূপ ভেদ জ্ঞান করিতে নাই। যে এরূপ ভেদ জ্ঞান করে, সে বৈষ্ণব নহে।" (প্রচার, বৈশাখ ১২৯২)। বঙ্কিমের সমাজচিন্তায় হিন্দু ও মুসলমানের স্থান সমান গুরুত্বপূর্ণ; 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে)। সহস্র লোকের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জনের যাতে শ্রীবৃদ্ধি নেই, বঙ্কিম বলবেন, "এমত শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে জয়ধ্বনি তুলিতে চাহে, তুলুক; আমি তুলিব না।" বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, 'বাঙ্গালি কৃষকের শত্রু বাঙ্গালি ভূস্বামী।' বাঙালি ভূস্বামীর সমৃদ্ধির সূচনা কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কাল থেকে—"ইংরাজরাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—কস্মিন্ কালে ফিরিবে না।" উনিশ শতকে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল দেখতে পান নি (যেমন শতাব্দীর সূচনায় রামমোহন রায় কিংবা বঙ্কিমের সমকালে রমেশচন্দ্র দত্ত)। শুধু প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সমালোচনা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সঙ্গে প্রজার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধির উপায় নির্দেশ করেছেন—"প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, প্রজারা সেই উৎপন্ন ভোগ করিত, সুতরাং সেই ধনটা তাহাদের হাতে থাকিত। সে বিষয়ে দেশের কোনো ক্ষতি হইত না। কেবল দুই চারি ঘরে তাহা রাশীকৃত না হইয়া লক্ষ লক্ষ প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত।...পাঁচ সাতজন টাকার গাদায় গড়াগড়ি দিবে, আর ছয় কোটি লোক অন্নাভাবে মারা যাইবে, ইহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছু কি সংসারে আছে?

সেই জন্যই কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্ত অতিশয় দূষ্য। প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চারি জন অতিধনবান ব্যক্তির পরিবর্ত্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখিতাম।" বলাবাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ কামনা করেন নি, সেখানে তিনি সমাজবিপ্লবের বিরোধী (যদিও তিনি জানেন, 'সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে?')। কিন্তু উদারনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী মানবতাবাদীর পক্ষে যতটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তিনি ততটাই অগ্রসর হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিমের 'প্রজাওয়ারি বন্দোবস্ত' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ বিধির কথা বলেছিলেন জানো?—ইংরাজিতে যাকে বলে Communal property। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, ইতিমধ্যে আমরা যদি বাংলার প্রজাকে peasant property না করে তুলি, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হতে আর বেশি দিন লাগবে না।"

শেষ পর্যন্ত তাই স্বীকার করতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তায় পরিণতি এলেও কোনও আমূল পরিবর্তন ঘটে নি। যুগের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করলে তাঁর মানসিক ঔদার্য ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদদের সঙ্গে তাঁর তুলনা অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। তাঁর চিন্তার সীমাবদ্ধতা, এমন কি স্ববিরোধ সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা অসম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ত আধুনিক পাঠককে অনেক ভুল বোঝার হাত থেকে রক্ষা করবে, অন্তত এই আশা নিয়েই তাঁর সমাজচিন্তার পরিচয় দেওয়ার এই সামান্য প্রয়াস।

প্রতিক্ষণ, সংস্কৃতি সংখ্যা, ১৩৯৫।

৭

উনিশ শতকে বঙ্কিম-বিরোধিতা

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যেন কিছুটা অপ্রত্যাশিত, অনপেক্ষিত ঘটনা। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) সে কালের বাঙালি পাঠকের এই বিস্ময়ের কথা বলেছেন, 'We all remember how, about ten or twelve years ago, the Bengali reading community was taken by surprise by the *Durges Nandini*, the first work of the author, and a master-work of creative imagination. It seemed as if a grand panorama had suddenly burst upon the reader's eye ; and if the mighty picture had any fault it was that the tints were too glowing, too dazzling, too bewildering.'[১] এই চোখ-ঝলসানো চমকপ্রদ সৃষ্টিকে সাদরে গ্রহণ করা সেদিন সহজ ছিল না। তারপরে বঙ্কিমের অন্যান্য বই বেরিয়েছে, 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বঙ্কিম-বিরোধিতাও প্রবল হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তখনকার বয়স্ক লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে কিরূপভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ মনে নাই। যেটুকু মনে পড়ে তাহাতে বোধ হয় বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার উপর এক দল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল। এবং ক্ষুদ্র যে লেখক সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা গালি দিত।"[২] বঙ্কিম-বিদূষণের পিছনে নানা ধরনের মানসিকতা কাজ করেছে, তবে তার মধ্যে প্রধান পাঁচটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—

১. সাহিত্যাদর্শ

২. ভাষাদর্শ

৩. 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সাহিত্যসমালোচনা

৪. সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয় মতাদর্শ

৫. পরনিন্দা ও বিদ্বেষবুদ্ধি।

অনেক সময় এগুলি একই সঙ্গে মিলে-মিশে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রকে সে সময় গ্রহণ করা বা স্বীকার করা অনেকের পক্ষে সহজ ছিল না। আমরা বঙ্কিম-বিরোধিতার কয়েকটি নিদর্শনসহ তার স্বরূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব।

২.

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর সাময়িকপত্রে যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তার একটা বড়ো অংশ চিরতরে বিলুপ্ত। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় দেখি 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাধারণ প্রশংসা করে শেষে মন্তব্য করে হয়েছে, "এদেশের লোকের এক বিষয় লইয়া অধিক বর্ণন করিবার যে একটী রোগ আছে, গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা দোষেরও বিন্দুপাত হইয়াছে। ভাষাটীও ললিত ও সর্ব্বজন হৃদয়গ্রাহিণী হয় নাই।"[৩] আমরা দেখব 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিম-বিরোধিতা ক্রমশ আরও বেড়েছে, এবং 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের (১৮১৯-১৮৮৬) 'সোমপ্রকাশ' বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দায় সর্বদা মুখর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'বিশুদ্ধতা'র অভাব 'সোমপ্রকাশ'কে পীড়িত করেছে, কিন্তু সম্ভবত শুধু ভাষাদর্শ নয়, সাহিত্যাদর্শ নিয়েই আসল বিরোধ। 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা সমালোচনাকালে 'সোমপ্রকাশে' লেখা হয়, "বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গ্রন্থনচাতুরী সাধারণের অবিদিত নাই। তাঁহার উপন্যাস সকলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষবৃক্ষের প্রারম্ভ

দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইল বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলার ন্যায় ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। যে উপন্যাস পাঠে পাঠকের কৌতূহল উত্তরোত্তর প্রদীপ্ত হয়, তাহাতেই যথোচিতরূপে উপাখ্যান গ্রন্থনের চাতুর্য্য আছে, এটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। উপাখ্যান যোজনার কৌশল বিকশিত না হইলে পাঠকের কোতুহল উদ্দীপনের সম্ভাবনা নাই। বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় বিষবৃক্ষে এই কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভেই সমাপ্তি ফল নির্দ্দেশ করিয়া নিতান্ত অবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সূচনাতেই আখ্যায়িকার সমুদয় ফল খুলিয়া বলিলে পাঠকের পাঠেচ্ছা বলবতী হওয়া সম্ভাবিত নহে। আদৌ উত্তরোত্তর উদ্ভাবনীশক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ কর্ত্তব্য ; পরিশেষে যখন প্রারম্ভ নিহিত বীজ ফলনোন্মুখ হইবার সময় উপস্থিত হইবে, তখনই সেই ফল নির্দ্দেশ করিয়া আখ্যায়িকার উপসংহার করা বিধেয়। কিন্তু বিষবৃক্ষ লেখক, এই চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বীজ অঙ্কুরিত না হইতেই কি তাহার ফল লক্ষ্য করিয়া আড়ম্বর করা বিধেয় ? এরূপ করিলে কি বক্তার শূন্যহৃদয়তা প্রকাশ পায় না ? বিষবৃক্ষের এইরূপ গল্পবন্ধন প্রণালী নিরতিশয় অসহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।”[৪] এখানে ‘বিষবৃক্ষে’র লেখকের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—‘চিরন্তন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়াছেন।’ ‘বঙ্গদর্শনে’র দ্বিতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা সমালোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের আর-একটি উপন্যাস ‘চন্দ্রশেখর’ আরও তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে—“বঙ্কিম বাবু স্বপ্রণীত ‘বিষবৃক্ষে’র প্রারম্ভেই যেরূপ মুক্তহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ‘চন্দ্রশেখরে’ সেরূপ করা হয় নাই। গ্রন্থনের সূচনায় সমুদয় কথা খুলিয়া বলিলে যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয় না, ‘বিষবৃক্ষ’ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বস্তুতঃ বঙ্কিম বাবু সময়ে সময়ে বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিকে যেরূপ ‘অপাঠ্য’ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার ‘বিষবৃক্ষ’ও সেইরূপ ‘অপাঠ্য’ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, চন্দ্রশেখরের অতি অল্প অংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে ; সুতরাং আমরা ইহার

গ্রন্থনচাতুরী সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। উপাখ্যানের প্রারম্ভেই গ্রন্থকার শৈবলিনীকে পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। এই শৈবলিনী চরিত্র আমাদিগের একান্ত রুচিবিকার জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্কিম বাবু যেরূপ জঘন্যভাবে শৈবলিনীকে চিত্রিত করিয়াছেন, এরূপ জঘন্য ভাব গৃহস্থ বাঙ্গালী কামিনীতে দৃষ্ট হয় না। এটী বঙ্কিম বাবুর অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তি ক্ষীণতার পরিচায়ক। ফলে বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস গ্রন্থন চাতুরী যে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলিই তাহার সাক্ষীস্বরূপ।"[৫] এখানে 'রুচিবিকার' এবং 'অসহৃদয়তা ও উদ্ভাবনী-শক্তিক্ষীণতার' অভিযোগ প্রধান হয়েছে, যদিও তার পিছনে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনার প্রতিক্রিয়া অস্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে ইংরেজি-শিক্ষিত লেখক ও সমালোচকদের কাছেও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আপত্তিকর মনে হয়েছে। লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪) 'বিষবৃক্ষে'র বিরুদ্ধে চারটি অভিযোগ এনেছেন, ১. 'One defect of the fable is the want of verisimilitude in some of its incidents.···The story is somewhat improbable and inconsistent with what happens in the country. There is evidently an attempt at sensational writing.' ২. 'Another still more glaring defect in the story is the want of consistency between the character of Nagendra and the action ascribed to him.' ৩. 'A third defect is the inconsistent character of Devendra.···The Brahmos have reason to complain of the insult offered to their religion.' ৪.'···poetical justice is not done to Kunda.···We should have been better pleased if Nagendra had hanged himself—he would then simply have reaped the fruit of his own iniquity.'[৬]

লালবিহারীর অভিযোগের মধ্যে একটা স্ববিরোধ আছে, একদিকে তিনি 'verisimilitude'-এর অভাবের কথা বলেন, অন্যদিকে 'poetical justice' প্রত্যাশা করেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ সে কালে অনেকেই করেছেন। লালবিহারীর বন্ধু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১) তাঁর 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনাকালে মন্তব্য করেন, "গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিমবাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, ইচ্ছা করিলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন।...এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিমবাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবন-তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন।"[৭] 'স্বর্ণলতা'র ভূমিকা-স্বরূপ মুদ্রিত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯-১৯১১) পত্রটিতে বঙ্কিমী-উপন্যাসাদর্শের প্রতি কটাক্ষ আছে, "ইংরেজী ধরণের প্রণয়-লীলা, চোর ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন"[৮] 'স্বর্ণলতা'য় নেই।

রমেশচন্দ্র দত্ত জানিয়েছেন, 'Critics and disappointed writers poured forth their rage on the devoted head of the young author, his style, his conceptions, his story, were all condemned, and he was put down as a denationalized writer, an imitator of European models.'[৯] ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থে দেখি চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্তের মুখ দিয়ে লেখক বলিয়েছেন,

"লেখক স্কট ও লিটন প্রভৃতির ইংরাজী পুস্তক হইতে যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার আপনার বুদ্ধি ও আপনার কল্পনা যোজনা হয় নাই, তাহাই কথঞ্চিৎ ভাবুক লোকের শ্রোতব্য হইয়াছে।" শুধু অনুকরণ নয়, সেই সঙ্গে হিন্দু-সংস্কার ও রুচির অন্যথাও লেখকের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে, যেমন "তাঁহার চিন্তা করা উচিত যে তিনি ভদ্রলোকের সহিত অধিককাল সহবাস করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, তাহাতে তাঁহাকে অধিক-কাল অসংখ্য ইতর অভদ্রজনের সহিত বাস করিতে হয়। সেই ইতর সহবাস নিবন্ধন তাঁহার রুচি কলুষিত হইয়াছে এবং ইতরতর বিষয়ে তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন, কেন না তিনি যখন যাহা লিখিতে যান, তখনই তাঁহার লেখনী হইতে ইতরভাবের উদ্ভাবন হইতে থাকে। দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ [দুর্গেশনন্দিনী] উৎসর্গ করিয়াছেন। কনিষ্ঠ হইয়া অশ্লীল গ্রন্থ, জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উৎসর্গ করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন নাই।" অন্যত্র, "তাঁহার রুচি ও উদাহরণ ঘৃণাজনক, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহার আসমানির পান-রস-নিষ্ঠীবন, বিদ্যাদিগ্‌গজের গলাধঃকরণ করান প্রভৃতি ঘৃণা-উৎপাদক রসিকতা তাঁহার বীভৎস রুচির স্পষ্ট পরিচয় দিতেছে। হিন্দু ও যবন জাতীয় নায়ক নায়িকা সংযোগ ব্যতীত, তিনি প্রায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন না। অনুভব হয়, তাঁহার ধারণা আছে, রাম-খোদা একত্রিত না হইলে কোন পাঠকের চিত্তবিনোদন করা দুঃসাধ্য।"[১০]

'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র লেখক ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী; কিন্তু ইংরেজি-শিক্ষিত এবং নিজেকে 'বঙ্কিম-শিষ্য' বলে পরিচয় দেন যিনি, সেই নবীনচন্দ্র সেনও (১৮৪৭-১৯০৯) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের অভিযোগ করেন। নবীনচন্দ্র নাকি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন, "আমি ত বরাবর আপনাকে বলিয়াছি, আপনার বিলাতী পীরিতের পিণ্ড পিণ্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরাজী 'নভেলে'র পতিপত্নীর ও উপপত্নীর

পীরিত! আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত—পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষ ঈশ্বরপ্রেম—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না। ছাইভস্ম নরনারী-প্রেমের ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারীহত্যার—বিশেষতঃ নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।" নবীনচন্দ্র আরও লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে "আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমনকি আদর্শ ভৃত্য পর্য্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙিয়াছেন—গড়িতে পারেন নাই।...বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিন ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।"[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'আদর্শ চরিত্র' নেই, কিংবা 'জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার যোগ নেই'—এমন অভিযোগ গত শতাব্দীর শেষভাগে অনেকেই করেছেন।

৩.

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যাদর্শের সমর্থনে বিশেষ কিছু লেখেন নি, কিন্তু ভাষাদর্শ নিয়ে বিরুদ্ধবাদীর মত খণ্ডনে তাঁকে একবার সচেষ্ট হতে দেখা যায়। রামগতি ন্যায়রত্নের (১৮৩১-১৮৯৪) 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে'র প্রথম সংস্করণে (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। রামগতি 'আলালের ঘরের দুলালের'র ভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "আজি কালি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে সকল উপাখ্যান পুস্তক লোকে আদরপূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকে, সে সকলেরও ভাষা কিয়ৎপরিমাণে প্রায় এইরূপ।...হুতোমপেচা বল, মৃণালিনী বল—পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে

পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয়বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়।"[১২] বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে প্রবন্ধে এর উত্তর দিলেন, "আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। বোধহয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই, সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদী ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদী ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরলচিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া,যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান্ হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।"[১৩]

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রামগতির একটি অসতর্ক মন্তব্যের প্রতিবাদ করলেও, রামগতি প্রমুখ পণ্ডিতদের বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার বিরুদ্ধে আনীত প্রধান অভিযোগ নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। রামগতির 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষার দোষ সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছিল, পরবর্তী সংস্করণে তিনি লেখেন, "আমরা প্রথম সংস্করণে দুর্গেশ-নন্দিনীর ভাষাগত কতিপয় দোষের প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং আশা করিয়াছিলাম

যে, পুনঃসংস্করণে সেগুলি সংশোধিত হইবে। কিন্তু সপ্তম সংস্করণেরও পুস্তক দেখিলাম, সে সকল দোষ তদবস্থই রহিয়াছে! বঙ্কিমবাবুর পুস্তকগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্য-সাগরের উজ্জ্বল রত্ন—সে সকল রত্নকে ওরূপ কীটাণুবিদ্ধ দেখিলে আমাদের ক্লেশ বোধ হয়। আমরা এবারে সে সকল দোষের আর পুনরুল্লেখ করিলাম না, কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি ঐরূপ দোষ সকলের সংশোধন করিয়া আমাদের ক্লেশ দূর করুন।"[১৪]

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের কাল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী সব রচনারই ভাষা সে কালে পণ্ডিতদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী এই ভাষা-বিতর্কের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, "বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নূতন বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাহা একদিকে বিদ্যাসাগরী বা অক্ষয়ী ভাষা ও অপরদিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আমার পূজ্যপাদ মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্কিমবাবু ও তাঁহার অনুকরণকারিদিগের নাম 'শব-পোড়া মড়া-দাহের দল' রাখিলেন। অভিপ্রায় এই, যাহারা 'শব' বলে তাহারা 'দাহ' বলে, যাহারা 'মড়া' বলে তাহারা তৎসঙ্গে 'পোড়া' বলে, কেহই 'শবপোড়া' বা 'মড়াদাহ' বলে না। তাঁহার মতে বঙ্কিমী দল ঐরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দোষী। আমরা, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 'শবপোড়া মড়াদাহের দল' বলিয়া বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে 'ভট্টাচার্য্যের চানা' নাম দিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।"[৫]

'সোমপ্রকাশে' বিভিন্ন সংখ্যায় নিয়মিতভাবে বঙ্কিমী-গদ্যের নিন্দা দেখা যায়; সাধারণভাবে 'বঙ্গদর্শনে' ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশে'র ধারণা, "বঙ্গদর্শনের অনেক স্থলে নিতান্ত কদর্য্যভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বাঙ্গালা প্রচার হইলে ভাষার উন্নতি হওয়া সুদূরপরাহত। বড়লোকের লিখিত বলিয়া কেহ যেন এইরূপ

ভাষার অনুকরণ না করেন। বঙ্গদর্শনের লেখকগণ লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা রচনা বিষয়ে যেরূপ চাপল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অবশ্য দোষ বলিয়া গণনা করা উচিত। রচনাগত দোষ সংশোধন করা লেখকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথায় তাঁহারা ভবিষ্যতে সুলেখক পাদবাচ্য হইতে পারিবেন না।"[১৬] শুধু 'সোমপ্রকাশ' নয়, সে সময়ে পাণ্ডিত্যাভিমানী অধিকাংশ সমালোচকই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাদর্শ বুঝতে পারেন নি, ফলে 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়ে'র লেখকের মতো অনেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে বলতেন, "যেমন কর্দ্দমাক্তনীররাশিসমন্বিতা নদী, স্বচ্ছ স্রোতস্বতীজলে বিমিশ্রিত হইয়া তাহা পঙ্কিল করে, সংপ্রতি সেইরূপ নীচজাতি ও উৎকৃষ্ট জাতিতে বিমিশ্রিত হইয়া শ্রেষ্ঠকে অপকৃষ্ট করিতেছে ও নীচ বিকলাঙ্গ ভাষা, সাধু বঙ্গভাষায় মিশ্রিত হইয়া, তাহা কিম্ভূতকিমাকার করিতেছে।...কোন সমালোচক বাবুর আপন লিখিত পুস্তকে কর্ত্তা ক্রিয়া প্রকাশ অপ্রকাশ রাখার স্থান বিচার নাই। কি মদগর্ব্বের প্রভাব! তিনি আশা করেন, তাঁহার ভাষাকে আদর্শ করিয়া, লোকে এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করুক। আ মরি মরি! তাঁহার কি অপূর্ব্ব-পদ-বিন্যাস! পড়িতে পড়িতে ভাবের প্রভাবে আষাঢ়ীয় আনারসের ন্যায় আমাদের অঙ্গ সকণ্টক হইয়া উঠে।"[১৭]

৪.

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি ও অখ্যাতি বহুগুণ বাড়ে। বিশেষভাবে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত 'প্রাপ্ত-গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন' সে কালে লেখকদের বঙ্কিমবিরোধী করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মনে আছে বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচকপদে আসীন ছিলেন তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।"[১৮] নবীনচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটি দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি, কোন কোন গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার্ জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয়, আমি এ

বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell) ।"[১৯]

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনায় কখনো ব্যঙ্গবিদ্রূপ থাকত বটে, কিন্তু অসূয়াচালিত হয়ে তিনি কখনো কাউকে আক্রমণ করেন নি। আসলে সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমের সাহিত্যাদর্শেরই প্রকাশ। বঙ্কিমের উপন্যাস জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর সাহিত্যাদর্শ সে সময় বাংলা দেশে সমাদৃত হয় নি। তা ছাড়া যেসব লেখকের বইয়ের তিনি নিন্দা করেন, সেই লেখকেরা ক্রমে বঙ্কিম-বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। 'সোমপ্রকাশ' যখন লেখে, "বঙ্গদর্শন প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় নিতান্ত চপলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার মতে বঙ্গভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ (দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি ব্যতীত) প্রচারিত হয়, তৎসমুদয়ই অপদার্থ। কোন গ্রন্থকারকে রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার ভয় দেখান, কোন গ্রন্থকারের গ্রন্থ অকর্ম্মণ্য ও অপাঠ্য বলেন। এরূপ উদ্ধতার পরিচয় দেওয়া ধীরজনোচিত কার্য্য নহে। বঙ্গদর্শন কেবল পরের দোষ খুঁজিয়াই বেড়ান, কিন্তু একবার নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। অপদার্থ উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালীদিগের নিকটেই বঙ্গদর্শনের গৌরব। একটী উপন্যাস শেষ হইলেই অমনি আর একটীর জন্য বঙ্গদর্শনে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইহাতেই আমাদিগের বাক্যের যথার্থ [যাথার্থ্য] প্রতীত হইবে। বস্তুতঃ বঙ্গদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের আদরভাজন হইতে পারে নাই।" তখন স্পষ্ট বোঝা যায় 'বঙ্গদর্শনে'র জনপ্রিয়তা কি ভাবে সে কালের লেখকদের বিচলিত করেছে, এবং গ্রন্থসমালোচনা থেকে শুরু করে বঙ্কিমের যে কোনো লেখাই সমান আপত্তিকর বিবেচিত হয়েছে। তা না হলে 'সোমপ্রকাশে'র লেখক বঙ্কিমের 'গর্দভ' প্রবন্ধটি সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মন্তব্যের কয়েক লাইন আগে এ রকম ভাষা ব্যবহার করতে পারতেন না, "বঙ্গদর্শনের যেরূপ মাহাত্ম্য ! ! ! 'গর্দ্দভ স্তোত্রটী' তাহার অনুরূপই হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। গর্দ্দভবুদ্ধি যখন যাহার ঘাড়ে চাপে সে সময়ে তিনি গর্দ্দভবৎ ব্যবহার করেন তাহা আশ্চর্য্যের

নহে। বঙ্গদর্শন গর্দ্দভবুদ্ধি বিশিষ্ট হওয়াতেই গর্দ্দভের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। হিতচিকীর্ষু বন্ধুর মনোরঞ্জন না করা কৃতঘ্নের কার্য্য। গর্দ্দভ বঙ্গদর্শনকে নিজের বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন ; সুতরাং তাহার মনোরঞ্জনার্থ স্তব না করিলে অকৃতজ্ঞতা দোষে দূষিত হইতে হয়।...'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'য় বঙ্গদর্শনের ন্যায় আর কেহ আগ্রহ সহকারে গ্রন্থকারদিগের 'মুণ্ড ভক্ষণ' করেন কি না সন্দেহ।"[২০] এখানে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ স্পষ্ট।

এই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকেই 'হালিসহর পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়—'আর আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম',

ও কে ওটা রাঙ্গা ছেলে রাঙ্গা লাঠি হাতে
আনি মানি খেলিতেছে সহরের পথে,—
যারে পায় তারে মারে দিগদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই ;
কোথা হতে ভুঁই ফোঁড়া চাঁদ চাওয়া ছেলে,
সহরের মাঝে আসি 'দর্শন' দিলে,
যা দেখে তাহাই ধরে করে হুলস্থূল,
হয়েছে সংবাদপত্র আর চক্ষুশূল,
ছিঁড়িব ছিঁড়িব বলি পড়িয়াছে ধুম,
আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম।
ভারতের মধুমাখা কবিতা লহরি
অনাসে ফেলিল ছিঁড়ি আবদার করি
আবল তাবল বকে সরস নিকস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস ;
হাবু ডুবু খায় তবু না বলিলে নয়,
বালক বলিয়ে সবে হেঁসে কথা কয়

ঈশ্বর চন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা
সেদিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা,
ছিঁড়িতে তাঁহার বই পেড়েছিল ধুম
আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম।
কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাত তালি দিয়ে,
কভু বা ভারত রচি করিতেছে গান
ঢেঁকির কচকচি যেন ভানিতেছে ধান,
কানা চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল,
আপনার রূপে হন আপনি পাগল,
কেবল গাধার মান মনেতে কি ভেবে,
সকলেই পূজে আপনার ইষ্টদেবে,
ছিঁড়িতে তাহার ঘাস পড়িয়াছে ধুম
আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম।[২১]

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বঙ্কিমের অপরাধ—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু নরম গরম সমালোচনা করিয়াছিলেন।"[২২] ফলে শুধু 'হালিসহর পত্রিকা' নয়, প্যারীমোহন কবিরত্নও (১৮৩৪-১৮৭৫) 'বঙ্গদর্শন' নিয়ে সেই ঢঙে গান বাঁধলেন,

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার।
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কার।
অন্ধ যে জন নাইক লোচন সমালোচন কেন তার।
পদে পদে দেখতে পাই, কর্ত্তা কর্ম্ম বোধ নাই,
ভাব রসের মা গোঁসাই, কেন লেখার ছল ধরে ;—
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে, দুট একটা গল্প লিখে,

ধরাটাকে সরা সম জ্ঞান করে :—
শুনে হাসি পায়, বাঁচিনে লজ্জায়
কালে বাপু পণ্ডিত হবে, এ কারখানা সেই প্রকার।
এ আস্পর্দ্ধা কব কারে, গোষ্পদ বলে না যারে,
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হ'ল না তার॥
হতেন যদি কূপ কি ডোবা,
তা হলেও তো পেতো শোভা,
নদনদী মধ্যে খুঁজে পাওয়া ভার।
মরি আপশোষে, কোন্ সাহসে,
কি জিনিষ বেরুল দেশে কিসের এত অহঙ্কার॥
ভারতচন্দ্র গুণাকরে, নিন্দুকেরাই নিন্দা করে,
ভারতে এরূপ রত্ন বেরুল বা কার।
অদ্যাপি কবি সকলে, মুক্ত কণ্ঠে কে না বলে,
কবিকুলের ছিলেন কণ্ঠরত্ন হার॥
সমকক্ষ নর, পাওয়া সুদুষ্কর,
ভারতে ভারত তুল্য কবি কেউ হবে না আর।
চেংড়া কৃষ্ণচন্দ্র রায়, শুনে শরীর জ্বলে যায়,
এর চেয়ে চেংড়ামো করা বোধহয় হ'তে পারে না।
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য, প্রভায় প্রভাহীন আদিত্য,
যে যশ যদ্যপি ধরায় ধরে না;
তাঁদের ধরা, ক্ষেপামো করা,
বাণেশ্বর শঙ্কর আদি সভায় ছিলেন সভ্য যাঁর।
যে লেখা লাগে নজরে, সে কলম কজনে ধরে,
কাকের ছানা বকের ছানা, হিন্দুর দেবতা থ্যাড় মাটি।-

ভুষি মাল ময়লা ধরা, ভেতরেতে গন্ধা ভরা,
কাগজগুলো কেবল ভাল, বাইণ্ডিং পরিপাটি !—
অতি যাচ্ছে তাই, যা দেখতে পাই,
সাগর বই লিখতে কে জানে—কার লেখায় কি উপকার ॥
(এখন) গ্রন্থকর্ত্তা ঘরে ঘরে, এডিটার বহু নরে,
(কিন্তু) কলম যে কিরূপে ধরে, তা অনেকে জানে না।
একখানা বিকোয় না দেশে, মশলা বাঁধে অবশেষে,
তবু কত সর্ব্বনেশে কলম ধরতে ছাড়ে না।
এ নয় উন্নতি, ঘোর অবনতি
মেয়েলি কথায় নাটক, লিখছে লোকে স্তূপাকার।
হুতোম প্যাঁচা বলেছিল, বলতে বলতে মনে হলো,
বেওয়ারিস বাঙ্গালা ভাষা, যার যা ইচ্ছা তাই করে ;
ওয়ারিস কেউ থাকলে পরে, অনেকে ঝুমঝুমি প'রে,
লেখার গুণে প্রায় যেতো দ্বীপান্তরে।
কেউ শত্রু নাই, এরা বাঁচে তাই
যে যা লেখে তাই শোভা পায়, মগের মুলুক অবিচার।
গনিরুথ যারা বোনে, তারা ভাবে মনে মনে,
কিংখাপ কাশ্মীরি শাল সে অতি সহজে হয় ;—
শাল যে কি বস্তু বোঝা, তাদের পক্ষে বিষম বোঝা,
কবিরত্ন বলে কথা সোজা নয় ;—
বামন হয়ে হায়, চাঁদে হাত বাড়ায়,
কালে কালে হলো কবি কদম্বের হাট-বাজার ॥[২৩]

এই সময় 'বসন্তক' পত্রিকায় চিত্রে ও রচনায় 'বঙ্গদর্শন'কে প্রায়ই ব্যঙ্গ করা হয়েছে, যার মধ্যে 'The Bull and the Frog' ছবিটি নানা কারণে সমধিক

প্রচার লাভ করেছে। চিত্রে বিদ্যাসাগরকে বৃষরূপে দেখানো হয়েছে, আর 'বঙ্গদর্শন'কে কোলা ব্যাঙরূপে, সেই সঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'র সমর্থকদের ক্ষুদে ব্যাঙরূপে; ছবির নিচে লেখা আছে, "বুড়া বেং—এত গরল গায়ে ছেড়ে দিলাম তবুও কিছু হোল না, রোস আমি ফুলে ওর সমান হোচ্ছি। দেখ দেখি ওর মতন হই নি? দলস্থ খুদে খুদে বেংচয়—বাহবা বাহবা আর একটু ফুলিলেই হবে!"[২৪]

এরপর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের (১৮৬১-১৯০৭) বেনামী রচনা 'বঙ্গীয় সমালোচক' (১৮৮০) কাব্যে শিষ্টাচার-শালীনতা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাঁদররূপে চিত্রিত করা হয়েছে (আক্ষরিক অর্থেই 'চিত্রিত'; কালীপ্রসন্ন বাঁদরবেশী বঙ্কিমের দুটি ছবি ছেপেছেন)। শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী তথা কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'অথ সমালোচকাখ্য বানরের রূপ বর্ণনা' কাব্যে লিখেছেন,

কাঁঠাল গাছের কাছে বানর বসিয়া আছে
[বসে কি দাঁড়ায় কেবা করিবে নির্ণয়?]
কি বাহার মরে যাই! চরণে পাদুকা নাই
চাপকানে অঙ্গঢাকা দেখে দুঃখ হয়।
মরি কি রূপের ছটা কোমর বন্ধক আঁটা
বিলোলিত লাঙ্গুলের কি সুষমা হায়!…ইত্যাদি।

এবং পরে 'অথ গুণ বর্ণনা'—

হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর
[যশের নিশান ধরি শীর্ষের উপর]
হে বঙ্গের আশাভূমি, ভেবো না ভেবো না তুমি
আপনারে অদ্বিতীয়; তব সম আর
শাখামৃগ অবতংশ দেখে নি সংসার।[২৫]…ইত্যাদি।

শুধু বঙ্কিমের সাহিত্যসমালোচনা নয়, তাঁর 'কবিতা পুস্তক' বইটিও কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। এখানে বঙ্কিমের প্রতি যে কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে, তার

মধ্যে বিদ্বেষের জ্বালা প্রচ্ছন্ন থাকে নি। বঙ্কিম-কথিত কোনো কোনো গ্রন্থকার যাঁরা তাঁকে মারতে পর্যন্ত সংকল্প করেছিলেন, মনে হয় তাঁরাই এই ধরনের রচনা প্রকাশে সক্ষম।

৫.

মতাদর্শজনিত বিরোধ অসম্ভব নয়। বিশেষত প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে যে-মতামত পোষণ করতেন তা অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছিল। বঙ্কিমের 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধের কোনো অংশ 'সোমপ্রকাশে'র কাছে সমর্থনীয় মনে হয় নি—"লেখক, মীবারবাসিগণ ভিন্ন আর সমুদয় হিন্দুকেই যে স্বাধীনতায় অনাস্থাবান্‌ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এটী আমরা কোনও প্রকারে স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর্য্যজাতির ইতিহাসে স্বাধীনতার অনেক গুণগান আছে।"[২৬] কিংবা 'বঙ্গদর্শনে'র অন্য একটি সংখ্যা সম্বন্ধে 'সোমপ্রকাশে'র মন্তব্য—"জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রস্তাবটী 'যেনতেন প্রকারেণ' করিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। প্রস্তাব লেখক উপসংহার সময়ে জীবনচরিত সংগ্রহের প্রথা অনুসারে মিলের সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে মিলের জীবনী সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই জন্মে না।"[২৭] এখানে যথার্থ কোনো প্রতিবাদ নেই; শুধুমাত্র 'সোমপ্রকাশে'র ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' এবং বিশেষত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ প্রকাশ-কালে অন্য পত্রিকায় তার প্রতিবাদ দেখা যায়। বঙ্কিম 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে 'সমাজদর্পণ' পত্রিকার মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিম-বিরোধিতায় সর্বাধিক সোচ্চার মনোমোহন বসু (১৮৩১-১৯১২) ও তাঁর 'মধ্যস্থ' পত্রিকা সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাব জানা যায় না। 'মধ্যস্থে'র দ্বিতীয় বর্ষে 'বঙ্গদর্শন' সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছিল, "বঙ্গদর্শন অনেকেরি প্রিয়দর্শন; সম্প্রতি তাঁর কলমের কার্দানি দেখে আবার আদার ব্যাপারী হ'য়ে জাহাজের খবর দেওয়াতে বাঙ্গালা বাজারে অনেকেরি

অপ্রিয় দর্শন হয়ে উঠেছেন! আজকাল এঁর এতদূর দৌড়, যে মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবিতার দোষারোপ করেছেন! এবং বর্ত্তমান বঙ্গভাষার বিধাতা পুরুষ, যাঁর শ্রীচরণ প্রসাদে অনেকেই কলম ধরতে শিখেছেন, সেই শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে মেকি লেখক বলিয়া ঠাট্টা কর্ত্তে কোমর বেঁধেছেন।"[২৮] প্যারীমোহন কবিরত্নের গান এই 'মধ্যস্থে'ই প্রকাশিত হয়। এবং 'সোমপ্রকাশে'র মতো 'মধ্যস্থ'ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'গর্দভ' রচনাটি বিশেষ আক্রমণের স্থল রূপে বেছে নেয়; 'মধ্যস্থে'র দুটি সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন—গর্দ্দভ' নামে তীব্র আক্রোশময় একটি রচনা প্রকাশিত হয় ('মধ্যস্থ', ৩২ শ্রাবণ ১২৮০ ও ৭ ভাদ্র ১২৮০)। কিন্তু শুধু লঘু রচনার ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শ নিয়েও 'মধ্যস্থে'র সঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে'র বিরোধ দেখা যায়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিম জমিদারদের যে ভাবে সমালোচনা করেন, তা মনোমোহনের সমর্থন লাভ করে নি। 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে বঙ্কিমের মতামতের প্রতিবাদ করা হয়। মনোমোহন লেখেন, "রাইয়তের প্রশংসা করিতে করিতে অন্ধ হইয়া লেখক একেবারে ঈর্ষ্যাবশতঃ জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছেন, রাইয়তের হিতকামনা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাই বলিয়া জমিদারের স্বত্ব লোপ করিতে হইবে!…সোসাইটি ইন্টারন্যাশন্যালের জনৈক সভ্য বিলাতে বড় বড় প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া সেইস্থানে ধান্য-বপন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনের লেখকও সেই ধাতুর লোক।" এবং তারপর ক্রুদ্ধ হয়ে লেখেন, "লেখক বলেন জমিদার দেশের প্রয়োজনীয় নহে, তাঁহার মতে এই শ্রেণীকে এককালে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। একি সামান্য বিদ্বেষীর কথা! বোধ হয়, তাঁহার এক কাঠা জমিও নাই, কাজেই ঈর্ষ্যায় এ সকল কথা বলিয়াছেন। এ সকল লোকের একখানি করিয়া ফটোগ্রাফ রাখা উচিত। কেননা এমন হিতৈষী আর নাই।"[২৯]

'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' বা 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ব্যাখ্যাও অনেকের পছন্দ হয় নি। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে একাধিক প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হেস্টির মতো

খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক থেকে শুরু করে প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটেছে। শতাব্দীর শেষ ভাগে শশধর তর্কচূড়ামণি ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাব ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এমন-কি 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকদের মধ্যেও অনেকে এই সময় হিন্দুধর্মের প্রচলিত ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁকেন। 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' গ্রন্থের লেখক হারাণচন্দ্র রক্ষিত বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য বই লিখলেও, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতামত ও বিশ্লেষণ সহ্য করতে পারেন নি। তাঁর কাছে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' "বিদেশীয় ধর্ম্মমতের গুরুভারে প্রপীড়িত। এখন মনে হয়, ইহার অনেক স্থানে অনেকরূপ অসামঞ্জস্য এবং ত্রুটি-বিচ্যুতিও আছে।" হারাণচন্দ্রের মনোভাব তথা দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয় উপর্যুক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সংযোজিত পাদটীকা থেকে, "এ হিসাবে পূজনীয় শ্রীম-লিখিত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'—অথবা সেই পুরুষোত্তমের অমূল্য উপদেশ—ধর্ম্মসাহিত্যে অতুলনীয়। এমন সার্ব্বজনীন উদার মত ও অপূর্ব্ব সরল ধর্ম্মব্যাখ্যা এ জীবনে আর দেখি নাই।" তাঁর মতে, "কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, ঐ গ্রন্থের মেরুদণ্ড (মূল ভক্তিবাদ) ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, গ্রন্থখানি প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত ভাবুকের নিকট মূল্যবান হইবে না।…ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর সহিত আমাদের মতবিরোধ আছে।"৩০

বঙ্কিমের ধর্মব্যাখ্যা সে কালে ব্রাহ্মদের কাছেও অত্যন্ত অপ্রীতিকর মনে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, "প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ। আক্রমণ গড়পড়তায় মাসে একটা। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে।"৩১ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করেছেন, "আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া

গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত, তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?"[৩২] রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে তাঁর এই লেখাকে 'লড়ায়ের উত্তেজনার' নিদর্শন বলেছেন, এবং জানিয়েছেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন, বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাদন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"[৩৩]

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মসী-যুদ্ধে'র বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।[৩৪]

নতুন চিন্তা-ভাবনা, নতুন সাহিত্যাদর্শ ও ভাষাদর্শ—নতুন বলেই তা সমালোচিত ও আক্রান্ত হয়। উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্রকে গ্রহণ করা বাঙালির পক্ষে সহজ ছিল না। রুষ্ট বিচলিত বাঙালি সেদিন প্রাণপণে বঙ্কিমী সাহিত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় বাধা দিয়েছে। কিন্তু অনতিপরে তাঁর প্রভাব অনতিক্রম্য হয়ে উঠেছে, অথচ প্রতিপক্ষের জেদ হার মানতে চায় নি। বিরূপ সমালোচনায় ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মতামত বা সাহিত্যরীতির কোনো পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক্ তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

এবং কল্পনা-প্রবল লেখকদিগের বেদনাবোধও সাধারণের অপেক্ষা কিছু অধিক। ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল। তিনি জানিতেন, বর্ত্তমানের কোনো উপদ্রব তাঁহার মহিমাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না—সমস্ত ক্ষুদ্র শত্রুর ব্যূহ হইতে অনায়াসে নিষ্ক্রমণ করিতে পারিবেন।"[৩৫] শতবর্ষের ব্যবধানে বঙ্কিম-বিরোধিতার বিবরণ আজ ইতিহাসের সামগ্রী; বঙ্কিম আজ ব্যক্তিগত রাগবিদ্বেষের উর্ধ্বে; কিন্তু সমাজ ও সাহিত্যের বিবর্তনধারার পরিচয় গ্রহণে বঙ্কিমবিরোধী লেখকদের রচনার মূল্য আছে।

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, মাঘ-আষাঢ় ১৩৮৯-৯০।

১. Ar Cy Dae [Romesh Chunder Dutt], *The Literature of Bengal*, Calcutta, 1877, p. 196.
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১, পৃ. ৫৪০
৩. 'দুর্গেশনন্দিনী', সোমপ্রকাশ, ১৩ বৈশাখ ১২৭২। দ্র. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬ [পরে 'সমাজচিত্র' নামে উল্লিখিত], পৃ. ৬৩৬-৩৭
৪. 'বঙ্গদর্শন', সোমপ্রকাশ, ১১ বৈশাখ ১২৭৯। দ্র. সমাজচিত্র, পৃ. ৬৪০-৪১
৫. 'সমালোচনা', সোমপ্রকাশ, ২১ শ্রাবণ ১২৮০। দ্র. সমাজচিত্র, পৃ. ৬৫৪
৬. [Lal Behari Day], 'Bisha-Briksha', *The Bengal Magazine*, Vol. II, No. 2, September 1873, pp. 95-96.

৭. তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বর্ণলতা, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৭০, পৃ. ৪

৮. তদেব, পৃ. ২

৯. *The Literature of Bengal*, Calcutta, 1895 p. 223.

১০. অলোক রায় সম্পাদিত স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ১৮-১৯

১১. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, চতুর্থ ভাগ (১৩১৮), দ্র. নবীনচন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, ১৩৮২, পৃ. ১২৮-২৯

১২. রামগতি ন্যায়রত্ন, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় সংস্করণ, চুচুড়া, ১২৯৪, পৃ. ২৬৫

১৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙ্গালা ভাষা', বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫, পৃ. ৮১

১৪. রামগতি ন্যায়রত্ন, পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৯

১৫. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃ. ২৮৩-৮৪

১৬. 'বঙ্গদর্শন', সোমপ্রকাশ, ১১ বৈশাখ ১২৭৯, দ্র. সমাজচিত্র, পৃ. ৬৪৩

১৭. স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয়, পৃ. ১৫-১৬

১৮. 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১, পৃ. ৫৫০

১৯. আমার জীবন, দ্বিতীয় ভাগ, দ্র. নবীনচন্দ্র রচনাবলী, পৃ. ৪০৯

২০. 'সমালোচনা', সোমপ্রকাশ, ২১ শ্রাবণ ১২৮০, দ্র. সমাজচিত্র, পৃ. ৬৫৫-৫৬

২১, হালিসহর পত্রিকা, ২৩ কার্ত্তিক ১২৮০। দ্র. মন্মথনাথ ঘোষ, 'বসন্তক', মানসী ও মর্ম্মবাণী, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ. ১৬৩

২২. বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, কলিকাতা, বিদ্যাভারতী, ১৩৭২, পৃ. ৩০১

২৩. প্যারীমোহন কবিরত্ন, গীতাবলী, কলিকাতা, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৩০৭, পৃ. ৭৩-৭৬

২৪. বসন্তক, অষ্টম সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, ১২৪ ও ১২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে।

২৫. ফকিরচাঁদ বাবাজী [কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ], বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য), কলিকাতা, ১২৮৭, পৃ. ৬-৮

২৬. দ্র. সমাজচিত্র, পৃ. ৬৪০

২৭. তদেব, পৃ. ৬৫৩

২৮. "মধ্যস্থ", ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০ ; দ্র. সুনীল দাস সম্পাদিত, মনোমোহন বসুর অপ্রকাশিত ডায়েরি, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৬১

২৯. "মধ্যস্থ", ৬ মাঘ ১২৭৯ ; দ্র. সুবোধ চৌধুরী, কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ২৬-২৭

৩০. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম, তৃতীয় সংস্করণ, মজিলপুর ২৪ পরগণা, ১৩১৭, পৃ. ১৪১-৪২

৩১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব্যহিন্দু সম্প্রদায়', প্রচার, অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৭১

৩২. দ্র. তদেব, পৃ. ১৭৫

৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৪০

৩৪. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম-জীবনী, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩৩৮, পৃ. ৪৪৮-৯৪

৩৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বঙ্কিমচন্দ্র', সাধনা, বৈশাখ ১৩০১, পৃ. ৫৫০

৮

হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান : বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র

উনিশ শতক থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। এইজন্যই হয়তো এ কালের পাঠক উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ততটা আগ্রহ বোধ করে না। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) সমকালে যে-খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন আজ তা ইতিহাসের সামগ্রী। স্কুলকলেজে 'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫) এখনও পড়ানো হয়, তাই নবীনচন্দ্রকে হয়তো আমরা একেবারে ভুলে যাই নি, কিন্তু প্রথম প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উচ্ছ্বাস—"পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালার সাহিত্যভাণ্ডারে একটি বহু মূল্য রত্ন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।"—এখন হয়তো অনেকের কাছে অত্যুক্তির নিদর্শন মনে হয়। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৬৮-১৯৪২) মতো প্রাজ্ঞ সমালোচকও কাব্যসমালোচনায় এই ধরনের মন্তব্যই যথেষ্ট বিবেচনা করতেন, "রৈবতকের এই সোঽহং সর্গ, গীতার বিশ্বরূপ দর্শনের অনুকরণে লিখিত। জগতের কাব্যে অতুল্য, সেই মহাকাব্যের মত, এই মহান উচ্চ, অপার্থিব সর্গের সমালোচনা অসম্ভব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বাঙ্গালাকাব্যে এমন আর কিছু পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আর বিশ্বপদ্মে বিশ্বনাথের অধিষ্ঠান বর্ণনায়, কবি যে, কত চিন্তাশক্তি, কত দার্শনিকতা, কত কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কথায় বুঝান যায় না" (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৭)। কাব্যরুচির পরিবর্তন, সেই সঙ্গে কাব্যভাষায় পরিবর্তন অতীত কাব্যকৃতি সম্বন্ধে অনাগ্রহের কারণ হতে পারে, কিন্তু সেটাই বড়ো কথা নয়। বিশেষত এমন কবি বা লেখকের রচনা, যিনি কিছুটা জোর দিয়েই বলেন—

কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক ; (নবীনচন্দ্র)

কিংবা

> সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। (বঙ্কিমচন্দ্র, 'মানসবিকাশ', বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০, পৃ. ৪০৩)

—সেই রচনা হয়তো যুগের প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত থাকে। বিশেষ করে এমন এক যুগ যা নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিচ্ছে। কালাতিস্থায়িত্বের কথা মনে থাকে সত্য, কিন্তু সেই মুহূর্তে উপস্থিত প্রয়োজন মেটানো অনেক বেশি জরুরি। উনিশ শতকের শেষ পাদে নিজের কালকে উপেক্ষা করা কোনো কবির পক্ষেই সম্ভব ছিল না। একে দোষ মনে করার কারণ নেই। তবে সেই সঙ্গে তাঁরা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—

> কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন (বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১২৭৯, পৃ. ২৭৪)

বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের তুলনার প্রশ্ন ওঠে না। আমরা শুধু দুজনের চিন্তা-ভাবনায় কোথায় কতটুকু মিল, আর কোথায় তাঁদের স্বাতন্ত্র্য তাই দেখাবার চেষ্টা করবো। দুজনে প্রায় একই সময় বা কাছাকাছি সময় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। দুজনেই কমবেশি পরিমাণে কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।

বঙ্কিমচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর বাল্যরচনার কথা বাদ দিলেও তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস যখন বেরোচ্ছে তখন নবীনচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র—আঠারো বছর বয়স। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের ছ'বছর পরে নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' 'মৃণালিনী' তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি বা অখ্যাতি দিয়েছে। ১৮৭২ সালে যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়, তখন নবীনচন্দ্র 'কবিযশঃপ্রার্থী নবাযুবক

—বছর চারেক চাকরি হয়েছে—সরকারি কর্মচারী-তালিকায় তিনি তখন সপ্তমশ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্রের ততদিনে বারো বছর চাকরি হয়ে গেছে—সরকারি কর্মচারী হিসাবে তিনি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত। 'বঙ্গদর্শনে' নবীনচন্দ্রের অন্তত পনেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'পলাশির যুদ্ধ' নবীনচন্দ্রকে যথার্থ কবিখ্যাতি দেয়। নবীনচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল কাব্যটি 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হোক। কিন্তু বঙ্কিম জানালেন, "বঙ্গদর্শনে ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে।" 'বঙ্গদর্শনে' অবশ্য 'পলাশির যুদ্ধে'র সমালোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, এবং 'বাঙ্গালার বাইরন' বলে তাঁর প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাতে খুশি হতে পারেন নি। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি পলাশির যুদ্ধকে মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য বলেন", তখন নবীনচন্দ্রের উত্তরে ক্ষোভের প্রকাশ—"আমি উহাকে অকাব্য বলি।" আসলে নবীনচন্দ্রের মনে হয়েছে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশের পর "বঙ্গসাহিত্যজগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—"It is unfortunate Hem should have made his debut before you—তোমার দুর্ভাগ্য যে, হেম তোমার পূর্ব্বে আসরে নামিয়াছে। কথাটা বুঝিলাম।" 'বৃত্রসংহারে'র প্রশংসায় বঙ্কিম কিছুটা বাড়াবাড়ি করেছিলেন। আমাদের অভিমানী কবি, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে একটু স্পর্শকাতর ছিলেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে 'আমার জীবনে'র পাতায় পাতায়।

১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলিতে কর্মরত—কাঁটালপাড়া থেকে রোজ হুগলি যাতায়াত করেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় ১৮৭৬ সালের মার্চের শেষ নাগাদ। নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' গ্রন্থে কাঁটালপাড়ায় বাড়ির এবং সে সময়ের বঙ্কিমচন্দ্রের সুন্দর বর্ণনা আছে—"আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র

নাতিবৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জল ; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসি-যুক্ত ; তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁপের তাড়া—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্য্যন্ত একটি সামান্য পিরান এবং পরিধান নয়নসুখের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্ত্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়।" প্রথম আলাপেই 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'পলাশির যুদ্ধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র সমালোচনা নিয়ে নবীনচন্দ্রের কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্যে বঙ্কিম 'বড় অপ্রতিভ' হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অহংকার ও দেমাক নিয়ে অনেক গল্পও শুনিয়েছেন নবীনচন্দ্র। প্রথম সাক্ষাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নাতি-ঠাকুর্দা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। নবীনচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র খুবই স্নেহ করতেন।

কয়েকমাস পরে কাঁটালপাড়ায় আর একবার দেখা হয় দুজনের। নবীনচন্দ্র জানিয়েছেন, "সে সন্ধ্যায় তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে, আমার যেরূপ অনন্ত উৎসাহ, আমি তাঁহার কাছে থাকিলে তাঁহার জড়ভরত অবস্থা ঘুচিয়া, তাঁহার হৃদয়েও কিঞ্চিৎ উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে।" ১৮৭৬-৭৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'জড়ভরত অবস্থা' এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। নবীনচন্দ্র নিজেই প্রথম সাক্ষাৎকারের পর মন্তব্য করেছেন, "তখন বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্ন। তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী পড়িবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ জন্য উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিত। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গ-ভাষায় নবযৌবন সঞ্চারিত করিয়াছে। সেই যৌবনের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত দেশ মুগ্ধ।" পারিবারিক কিছু অশান্তি ছিল সত্য, কিন্তু এই সময় তিনি (বঙ্গদর্শনে অসমাপ্ত) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্পূর্ণ করেছেন। 'দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' লিখেছেন। হুগলিতে কর্মরত অবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, কবিতাপুস্তক, কৃষ্ণকান্তের উইল, প্রবন্ধ পুস্তক ও সাম্য বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এরপর নবীনচন্দ্রের আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে—চাকরিজীবনের কোনো কোনো সংকট

মুহূর্তে নবীনচন্দ্র তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। তবে প্রায় সব সময়ই দেখা যাবে নবীনচন্দ্রের স্বাধীন চিন্তাভাবনা বিশেষত সাহিত্যাদর্শ নিয়ে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছে। যেমন ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলিকাতায় বৌবাজারে বাস করেছেন, 'আনন্দমঠ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র তখন বঙ্কিমকে বলেন—"উহার [বন্দেমাতরম্ গানের] মাঝে মাঝে বাঙ্গালা লাইনগুলি বসাইয়া তিনি গীতটি মাটি করিয়াছেন। ঐ লাইনগুলি গীতটির প্রাণ ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে। উহা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন খাপছাড়া বোধ হয়। আগাগোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত।" বঙ্কিমের স্বভাবসিদ্ধ উত্তরটি ছিল—"বাঙ্গালা লাইনগুলি তোমার ভাল না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও।" নবীনচন্দ্রের মনে হয়েছে, "আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় উপন্যাসের মধ্যে 'আনন্দমঠ'ই নবীনচন্দ্রের কাছ থেকে সবচেয়ে প্রশংসা পেয়েছে। নবীনচন্দ্রের ধারণা ছিল তাঁর কথা মতো 'আনন্দমঠ' উপন্যাসটি লেখা হয়েছে—"আমিই বঙ্কিমবাবুর প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া, স্বদেশমূলক একখানি উপন্যাস লিখিতে তাঁহাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। অতএব আজ আমার আর আনন্দের সীমা নাই। ভগবন্! সকলই তোমার লীলা! তুমি এই পতিত জাতির হৃদয়ে ঐক্য, সমতা, শক্তি দেও, যেন এই মহামন্ত্র সাধনের দ্বারা এই জাতি উদ্ধার লাভ করিতে পারে।" নবীনচন্দ্র আরও জানিয়েছেন 'আনন্দমঠ' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে লেখেন, "It follows exactly the lines of your Rangamati." এবং "রঙ্গমতীর দরুন তাহার কয়েক অধ্যায় তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।"

আসলে উপন্যাস সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে একাধিকবার বলেছেন 'নভেল ছাড়িয়া' গুরুতর রচনায় হাত দিতে। তিনি নাকি ১৮৯৩ সালেও বঙ্কিমকে বলেন—"আমি ত বরাবর আপনাকে

বলিয়াছি, আপনার বিলাতী পিরীতের পিণ্ড পিণ্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরাজী নভেলের পতি-পত্নীর ও উপপত্নীর পিরীত। আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তা শুনিলেন না। ছাইভস্ম নর-নারীপ্রেমের উগ্র ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারী হত্যার—বিশেষতঃ নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।" বঙ্কিমচন্দ্র নাকি এর উত্তরে বলেন—"সত্য, নবীন! আমি এখন ভাবিতেছি যে, আমি নভেল লিখিয়া দেশের হিত কি অহিত করিয়াছি! এজন্য তুমি দেখিয়াছ, আমি আমার শেষ উপন্যাসগুলিতে ধর্ম্মের সুর ধরিয়াছি।" কিন্তু নবীনচন্দ্র তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি বঙ্কিমকে বলেছেন—"ধরিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বের নভেলে যে তীব্র বিষ ঢালিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার যে এরূপে হইবে, আমার বড় বিশ্বাস নাই। পাপের ছবিগুলি যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও মাদকতাপূর্ণ, পুণ্যের ছবি কি সেরূপ হইয়াছে? আপনার উপন্যাসের উচ্চশিল্প ও ধর্ম্মনীতি সাধারণে, বিশেষত রমণীদের মধ্যে কয়জন বুঝিতে পারে? আমি সেজন্য বলিতেছি, আপনি উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসটিতে হাত দিন।" কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তখন আর বেশি সময় ছিল না—উপন্যাস তিনি ছেড়েছিলেন—কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব লিখেছিলেন—তবু নবীনচন্দ্রের মতো অনেকেই তাঁদের অসন্তোষ গোপন করতে পারেন নি। নবীনচন্দ্র সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'আদর্শ চরিত্র' নেই—"রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমন কি আদর্শ ভৃত্য পর্য্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন—গড়িতে পারেন নাই।...একথা তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া, আমি বারংবার তাঁহাকে লিখিয়াছি।"

আমাদের কাছে কৌতুককর মনে হতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পাদে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নীতি-বিগর্হিত প্রেমের চিত্র বা সনাতন আদর্শচ্যুতি অনেকের কাছেই আপত্তিকর বিবেচিত হয়েছে (পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসুর বঙ্কিম-সাহিত্যালোচনার কথা মনে পড়বে)। নবীনচন্দ্রের বিবরণ থেকে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন—উপন্যাস লিখে তিনি দেশের অহিত করেছেন। আর সেই জন্যই কি তিনি আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম লেখেন? কিন্তু সেখানেও রামায়ণ-মহাভারতের 'আদর্শ চরিত্রে'র সন্ধান পাওয়া যায় না। আর 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখেও তিনি নবীনচন্দ্রের মতো পাঠককে তুষ্ট করতে পারেন না, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের আরাধ্য কৃষ্ণ আর নবীনচন্দ্রের আরাধ্য কৃষ্ণ নামে এক হলেও একজন ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সন্ধান করেছেন, অন্য জন পৌরাণিক কৃষ্ণের। 'কৃষ্ণচরিত্র' পড়ে বঙ্কিমকে নবীনচন্দ্র লেখেন—"কৃষ্ণপ্রেম ও গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেম কথাটি মাত্র আপনি ইংরেজিনবিশদের ভয়ে মুখে আনেন নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব যে কৃষ্ণপ্রেম, গোপ-গোপীপ্রেম ও রাধাপ্রেম লইয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন, নাচিতেন ও মূর্চ্ছিত হইতেন তাহা কি একটা মিথ্যা কথা লইয়া? আমার বোধ হয়, আপনি এখনও ব্রজলীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ আপনি চৈতন্যদেবের বিদ্বেষী। আপনি বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব অৰ্দ্ধেক বৈষ্ণবধর্ম্ম মাত্র বুঝিয়াছিলেন। বোধ হয় চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে কোনো বহি আপনি এই বিদ্বেষবশতঃ পড়েন নাই। ক্ষমা করিবেন, এই জন্য বোধহয়, ব্রজলীলাও আপনি বুঝিতে পারেন নাই।" পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা বদলেছে, কিন্তু নবীনচন্দ্র সংগত কারণেই বলেন, "বঙ্কিমবাবুর এই পরিবর্ত্তিত মতের কৃষ্ণ এবং আমার রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণও কি এক? বঙ্কিমবাবু ভাগবত উড়াইয়া দিয়াছেন। ভাগবতের ও মহাভারতের কৃষ্ণই কি রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ নহে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র প্রায় একই সময় শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে গদ্যে এবং পদ্যে গ্রন্থ রচনা করেছেন—সেই জন্যই মিল-অমিল নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কে কার কাছে ঋণী—

তা নিয়ে সে কালে বেশ উত্তপ্ত বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১২ আগষ্ট ১৮৮৬। 'রৈবতকে'র প্রকাশকাল ১৬ আগষ্ট ১৮৮৬। তবে 'কৃষ্ণচরিত্র' 'প্রচার' পত্রিকায় তার দু'বছর আগে থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে। অন্যদিকে নবীনচন্দ্রের দাবি তিনি 'রৈবতকে'র 'প্লট' ১৮৮২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়েছিলেন, "অতএব স্বয়ং বঙ্কিমবাবু...আমার সাক্ষী যে, রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী নহি। তবে তাঁহার কাছে এ পরিমাণে ঋণী যে, তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত না হইলে রৈবতক কুরুক্ষেত্র শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইতে পারিত কিনা সন্দেহ।" আসলে এ বিতর্ক এক হিসাবে নিরর্থক, কারণ বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দুজনের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হলেও দুজনে একই যুগপ্রেরণা থেকে কৃষ্ণচরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী উনিশ শতকের শেষভাগে এই রকম দুটি যুগবিভাগ নির্দেশ করেছেন—১৮৭০ থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনাকাল এবং ১৮৮০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কাল। সাল তারিখ নিয়ে সামান্য কিছু মতান্তর থাকতে পারে, কিন্তু ১৮৭২ সালে তিন আইন নামে যে নেটিভ ম্যারেজ অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হলো তার প্রতিক্রিয়ায় আদি ব্রাহ্মসমাজের 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' প্রতিপাদনের প্রয়াস এবং সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভার প্রচারাদি এবং ১৮৮২ সালে কলিকাতার টাউন হল-এ কর্নেল অলকটের 'Theosophy : The Scientific Basis of Religion' নিয়ে বক্তৃতা, 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা প্রকাশ (১০ ডিসেম্বর ১৮৮১), অনতিপরে শশধর তর্কচূড়ামণির কলিকাতায় আবির্ভাব (১৮০৪), 'নবজীবন' ও 'প্রচার' (১৮৮৪) পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা মোটের উপর যুগপ্রবণতার পরিচয় দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এই সময় (১৮৮১-৮২) কলিকাতায় অবস্থান করছেন। তাঁর গৃহে সাহিত্যিক অনেকে আসতেন, তিনি 'আনন্দমঠে'র পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাতেন, পজিটিভিজম নিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করতেন। ধর্মতত্ত্ব এবং

হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বঙ্কিমের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। রেভারেণ্ড হেস্টির সঙ্গে হিন্দু ধর্ম নিয়ে বিতর্ক ; যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা ***Letters on Hinduism*** 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্র নিয়ে প্রবন্ধ রচনা ("নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম!")—এগুলিকে সমকালের পটভূমিকায় স্থাপন করা প্রয়োজন। তবে হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যায় বঙ্কিম সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও 'হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ী দলে'র প্রতি তাঁর কোনো সমর্থন বা সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে বঙ্কিমের তথাকথিত শিষ্যরাও (অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি) বঙ্কিম-ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্ম অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারেন নি।

নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কলিকাতার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। ১৮৮৪ সালে তিনি নোয়াখালিতে চাকুরিরত। 'আমার জীবন' গ্রন্থ থেকে জানি থিওজফিস্টদের প্রচারে সে কালে অন্য অনেকের মতো নবীনচন্দ্রও প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন তাঁর মনে হয়েছিল "থিওসফি আসিয়া সদ্য চেতনাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের চক্ষুরুন্মীলন করে।" কর্নেল অল্‌কট যখন থিওজফি প্রচার উপলক্ষে নোয়াখালি আসেন তখন তাঁর সঙ্গে নবীনচন্দ্রের পরিচয় হয়। অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে অল্‌কটের একটি বক্তৃতাসভায় 'নিতান্ত অনিচ্ছায়' তিনি সভাপতিত্বও করেন এবং এগারো টাকা দক্ষিণা দিয়ে থিওজফিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদও গ্রহণ করেন। থিওজফির মূল নীতি ("যে সকল আবর্জ্জনা হিন্দুধর্ম্মের এই জড়ত্ব যুগে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, 'থিওসফি' আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, তাহা হিন্দুধর্ম্ম নহে। সেই ভস্মের অভ্যন্তরে যে বহ্নি আছে, উহাই হিন্দুধর্ম্ম।") নবীনচন্দ্রের কাছে গ্রাহ্য হলেও, তাঁর প্রধান আপত্তির কথা তিনি অল্‌কটকে জানিয়েছিলেন—"থিওসফির মূল ত্রিনীতি—সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা, আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলন, এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহার জন্য শত শত সম্প্রদায়ে

বিভক্ত ভারতে আর একটি সম্প্রদায় স্থষ্টির প্রয়োজন কি, আমি বুঝি না।"

আসলে থিওজফির সঙ্গে 'সনাতন আর্য্যধর্ম্মে'র যেখানে যোগ সেখানে থিওজফিকে সমর্থন করতে নবীনচন্দ্রের আপত্তি নেই, কিন্তু তথাকথিত 'আধ্যাত্মিক বিদ্যা' চর্চায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে আধুনিক 'জড়ত্ব ব্যবসায়ীরা' যেভাবে হিন্দুধর্মকে পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেন, এবং তার প্রতিবাদে "চূড়ামণি মহাশয় যেরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবে যে হিন্দুধর্ম্ম সাত শত বৎসর মাটি চাপা পড়িয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের আশা" তাঁকে সাময়িকভাবে উজ্জীবিত করেছে। আসলে দূর থেকে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণিকে তখন দেখেছেন। পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র যেভাবে শশধরের উদয় এবং অস্তগমন ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে কবির ধর্মভাবনার পরিচয় মেলে—

"এখন আবার হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় উঠিয়াছে যে, তাহারা বিদেশীয়ের [থিওজফিস্টদের] মুখের শত যুক্তিপূর্ণ কথা বাঙ্গালীর উপযোগী রসিকতায় বা ইতরতায় উড়াইয়া দিবে, এবং অনুষ্টুপ ছন্দে নিতান্ত গর্দ্দভোপযোগী কোনও কথা কোথাও প্রক্ষিপ্ত থাকিলে তাহার দোহাই দিয়া কর্ণ বধির করিবে। ইহারা যে এই ছাইভস্ম বিশ্বাস করে তাহা নহে। তবে মুদি দোকানদার প্রভৃতিরা উহা বিশ্বাস করে,—এমন অদ্ভুত কথা কিছুই নাই, যাহা তাহারা শাস্ত্রের নামে বিশ্বাস করিবে না, এবং ও সকল অন্ধ জড়ত্বের দোহাই দিলে অর্থোপার্জ্জন চলে, এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তৃপ্তি সাধিত হয়। এ জন্য 'থিওসফি' বিদেশীয় মুখে যাহা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ী কেহ বলিলে, ইহাদের মুখ বন্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া বোধহয়, পূজনীয় বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সেই অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতচূড়ামণিকে এই ব্রতে ব্রতী করিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে যখন প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, তখন দেশে একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি পাঠ্য অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে—ছাড়িয়া, আমাদের দেবদেবীর মূর্ত্তি ব্যাখ্যা করিয়া 'আবাহন' ও 'শবসাধন' প্রভৃতি কবিতা

লিখিয়াছিলাম। এখন একজন পণ্ডিতের মুখে এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার এত আনন্দ হইল যে, আমি তখন কলিকাতায় থাকিলে ইঁহার কাছে দীক্ষিত হইতাম। বলাবাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যার পথ পূজ্যপাদ ও অদ্ভুতকর্ম্মা ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তৎশিষ্য ৺কেশবচন্দ্র সেন পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। শুনিলাম যে 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'হিন্দুধর্ম্মে'র এই আধ্যাত্মিকতা ইংরাজি শিক্ষার পথে বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎশিষ্যগণ এবং হিন্দুশাস্ত্রের পথে এই শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিবেন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ীর দল দেখিল যে, তাহাদের ব্যবসা মারা যায়। তখন তাহারা এই চূড়ামণিকে হস্তগত করিয়া, তাহাদের দলভুক্ত করিল, আর তিনিও দেশপূজ্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'বেদব্যাস' পত্রিকার বেদব্যাস হইলেন ও সেই সঙ্গে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন।"

নবীনচন্দ্র 'আমার জীবন' গ্রন্থে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকার সমালোচকের মন্তব্য সগৌরবে উদ্ধৃত করেন—'Babu Nabin Chandra Sen is undoubtedly the poet of the Hindu revival.' বঙ্কিমচন্দ্রকেতো সে কাল থেকে এ কাল পর্যন্ত প্রায় সকলেই হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনের প্রধান পুরোধা বলে অভিহিত করেছেন। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সে কালে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনে দুটি ধারা লক্ষ্য করেছিলেন—'One of the two branches of this movement, that headed by Pundit Sasadhar Tarkachuramani and Kumar Srikrishnaprasanna Sen, being what may be termed illumination-proof, is devoid of the neo-romantic element of reconstructive transfiguration which is the child of illumination, and does not therefore come within our purview. Neo-Hinduism [Hindu revivalism], properly speaking, applies only to the other movement, led by Babu Bankimchandra Chatterji as its theologian and

constructive thinker, Babu Chandranath Bose, as its miscellaneous essayist and critic, and Babu Nabinchandra Sen, as its epic poet.' (*New Essays in Criticism*, 1903, p 88-89)

কোনো সন্দেহ নেই শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫০-১৯২৮) ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (১৮৫১-১৯০২) এক সময় সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে খুবই সাফল্য লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতার জনসভায় শশধরকে শ্রোতাদের কাছে প্রথম পরিচয় করে দেন, কিন্তু মাত্র দুদিন যাওয়ার পর তাঁর মোহভঙ্গ ঘটে, তাঁর মনে হয়, "তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়।" এবং লেখেন "পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিঁকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।" ('হিন্দুধর্ম্ম', প্রচার, শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫) অবশ্য শশধরের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন সে কালের অনেক বিখ্যাত বাঙালি, যেমন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং বিশেষভাবে চন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে শশধরের ধর্মব্যাখ্যার কোনো মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তাঁহার প্রচার পত্রে তিনি যে-ধর্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।" তর্কচূড়ামণি মহাশয় যখন কলিকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, নবীনচন্দ্র তখন নোয়াখালিতে অবস্থান করছেন। তবে শশধর-শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের ধর্মপ্রচারের উত্তাপ-উত্তেজনা তখন পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতেও সঞ্চারিত হয়েছে। নবীনচন্দ্র মনে হয় প্রথম থেকেই (তাঁর ভাষায়) 'শশধরী হুজুগ' সম্বন্ধে নির্মোহ ছিলেন। তিনি লিখেছেন, "মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের একটা হুজুগ উঠিয়াছিল। আমি যখন নোয়াখালিতে তখন চূড়ামণি মহাশয় ধূমকেতুর মত বঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের আকাশে

কলিকাতায় উদিত হন। শুনিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান জড়ত্ব, যাহাতে হিন্দুজাতির এই অননুভবনীয় অধঃপতন ঘটাইয়াছে—ঘুচাইয়া, তাহাতে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। আমরা যে কথা বলি, এই জড়ত্ব-ব্যবসায়ীরা তাহা 'ইংরাজি শিক্ষার বিমল জলে ধৌত' অশাস্ত্রীয় বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু পণ্ডিতকুলের একজন চূড়ামণি সেই কথা বলিলে আর শাস্ত্রের দোহাই দিবার পথ থাকে না। অতএব চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল।"

তাহলে নব্য হিন্দুধর্মের প্রচারে 'পেশাদারি হিন্দুয়ানির ঢক্কানিনাদে কর্ণ বধির' হওয়ার সময় বঙ্কিম ও নবীন কিছুটা স্বতন্ত্রভাবে ধর্ম নিয়ে ভাবছেন। ১৮৮২ সালে হেস্টির সঙ্গে বিতর্কের সময় বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে জানান—ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, বা জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্মের সারবস্তু নয়—এগুলি নারকেলের ছোবড়া মাত্র। ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসে 'প্রচার' পত্রিকায় 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে তিনি যে প্রথম প্রবন্ধটি লেখেন, সেখানে পেশাদারি হিন্দুয়ানির সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যাত হিন্দুধর্মের পার্থক্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—"সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে আমরা হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি।…কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগ-যুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 'সত্য সত্য' বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্থে খাইতে নাই, শূন্যকলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমরা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।" শশধর

এই সব আচারের বৈজ্ঞানিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন। বঙ্কিমের ধর্মব্যাখ্যার সঙ্গে এঁদের মতামতকে মেলাবার চেষ্টা করে লাভ নাই। এমনকি বঙ্কিমকে সমকালের হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানবাদীদের বিরুদ্ধপক্ষ মনে করলেও ভুল হয় না।

প্রায় একই সময় নবীনচন্দ্রও ধর্ম নিয়ে চিন্তা করছেন। হেস্টি-বঙ্কিম বিতর্কের সময় নবীনচন্দ্র বঙ্কিমকে লেখেন, "একজন ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে এই নিষ্ফল পত্রযুদ্ধে তাঁহার মহামূল্য সময় নষ্ট না করিয়া, তিনি যদি তাঁহার শেষ জীবনে [বঙ্কিমের বয়স তখন মাত্র চুয়াল্লিশ], হিন্দুধর্ম্ম, গঙ্গোত্তরী বেদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপ গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়াছে, তাহার একটি দার্শনিক ইতিহাস (Philosophical history) লেখেন তবে উহা তাঁহার প্রতিভার ও শক্তির একটি যুগান্তকারী কার্য্য হইবে।" আসলে নবীনচন্দ্র চাইছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের দার্শনিক ইতিহাস লিখুন। নবীনচন্দ্র জানিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি তাঁকে লেখেন—"আমি যে বৃহৎ কার্য (grand work) তাঁহার দ্বারা করাইতে চাই, উহা শেষ জীবনে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।" তখন নবীনচন্দ্র নিজেই সেই 'বৃহৎ কার্য্যে' হাত দিলেন—"আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে খণ্ড ভারতে মহা-ভারত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি কাব্যের প্রস্তাবনা লিখিলাম—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস।" বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি তাঁর পরিকল্পনা, এবং রৈবতকের যেটুকু অংশ লিখেছিলেন তা পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে চিঠিতে লিখলেন—'You have planned a new Mahabharat,inded—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of Haribansa and Adhatya Ramayana···Properly executed the poem will of course take its rank as the greatest in the

language.' বঙ্কিমের আপত্তি শুধু শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাহ্মণ-বিরোধীরূপে উপস্থাপনে এবং ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ এবং অনার্যদের সম্মিলিত চক্রান্তে (এছাড়া অন্য আপত্তিও ছিল, কিন্তু চিঠিতে তার উল্লেখ নেই)। বঙ্কিমের সতর্কবাণী—'I have advised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned. But I am hardly bold enough to advise you to do so in the case of large national movements.' (Bankim Chandra Chatterjee, ***Essays and Letters***, 1940, p. 200-01) নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের ভাগবত-মহিমা প্রচারের সঙ্গে তাঁকে ধর্মসংস্কারক ও ধর্মস্থাপক অর্থাৎ মহা-ভারত রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্বে'র সঙ্গে দেশকালের একটা যোগ ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু দুজনের কেউই জনমনের সমর্থনের দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণচর্চায় অগ্রসর হন নি। আবার দুজনের কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যাতেও তফাত ছিল।

এখানে প্রসঙ্গত বঙ্কিম ও নবীনের গীতাচর্চা সম্বন্ধেও আলোচনা করা যেতে পারে। উনিশ শতকের শেষ পাদে ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ধর্মালোচনার প্রধান উপায় হয়ে ওঠে। গীতার ভাষ্য ও টীকা রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র দুধরনের টীকার কথা বলেছেন—১. শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাংলা অনুবাদ, ২. নতুন বাংলা টীকা প্রণয়ন। হিতলাল মিশ্র, কেদারনাথ দত্ত, শশধর-শিষ্য ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম রীতি অনুসরণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় রীতি গ্রহণ করেছেন। নবীনচন্দ্র গীতার পদ্যানুবাদ করলেও তাঁর অনুবাদ কিছুটা ব্যাখ্যাধর্মী, আর গীতা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে যা তিনি ভূমিকায় সবিস্তারে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে "কাব্যে ও ধর্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র

উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম—নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই নিষ্কামত্ব বা কামনার নির্ব্বাণই বৌদ্ধধর্ম্মের—নির্ব্বাণ।” নবীনচন্দ্র কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে ভারতাত্মার প্রকাশ হিসাবে দেখেছেন। ‘রৈবতক’ লেখার আগে যদিও তিনি ভগবদ্গীতা পাঠ করেন নি, কিন্তু আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ‘এই দুই মহামূর্ত্তি ও তাঁহাদের অমানুষিক লীলা’ অন্তরে প্রত্যক্ষ করতেন। নবীনচন্দ্রের গীতার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু অর্ধমূল্যে (আট আনা দামে) প্রচার করা সত্ত্বেও সে অনুবাদ সম্ভবত হুজুগমত্ত হিন্দুসমাজে তেমন সমাদর পায় নি, তাই ‘আমার জীবনে’ ক্ষোভের সঙ্গে কবি বলেন—“তখন ‘গীতা হুজুগ’ কলিকাতায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদে কান ফাটিতেছে। অর্দ্ধমূল্যেই বা আমার অনুবাদের খবর কে লয়?” অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ এই গীতাহুজুগের সূচনা করেছে বলা সংগত নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে গ্রন্থাকারে তাঁর রচনা আদৌ প্রকাশিত হয় নি। ‘প্রচার’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে (১৮৮৬) তিনি তাঁর রচনার ভূমিকায় লেখেন, “পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে [পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের] বুঝান, এই আমার টীকার উদ্দেশ্য।” আনন্দগিরি টীকা-সংবলিত শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকার প্রতি দৃষ্টি রাখলেও অনেক স্থানেই তাঁকে নিজস্ব ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে, কারণ “যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব্ব-পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।” হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের

যুগে একথা বলা সহজ ছিল না। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতাভাষ্যও জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিল, এমন মনে হয় না।

নবীনচন্দ্র ১৮৮০ সালে তাঁর 'রঙ্গমতী' কাব্যটি 'কবিরত্ন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়'কে উৎসর্গকালে যে অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, এবং বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে নবীনচন্দ্রের কাব্যের যে প্রশংসা করেন, তা থেকে উভয়ের প্রীতিমধুর সম্পর্ক অনুভব করা যায়। অবশ্য দুজনের সাহিত্যাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র, তাও আমরা জেনেছি। দুজনে প্রায় একই সময়, বা কাছাকাছি সময় ধর্মজিজ্ঞাসায় আকুল হন, যদিও দুজনের এক্ষেত্রে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ছিল ভিন্ন ধরনের। "এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়।"—এ প্রশ্ন শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নয়, নবীনচন্দ্রের মনেও জেগেছে। হয়তো এ প্রশ্ন উনিশ শতকের শেষপাদের বাঙালির মনে সাধারণভাবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম যখন বলেন, "সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।"—তখন বৃত্তি, ভক্তি বা মনুষ্যত্বের তাৎপর্য হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত বলা যায় না। 'ধর্ম্মতত্ত্বে' শিষ্য তাই গুরুকে বলে—'আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।" জীবনের প্রান্তভাগে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে বিতর্ককালেও এই স্বাধীনবুদ্ধি চালিত হয়ে বঙ্কিমকে বলতে শোনা যায়—"অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।" নবীনচন্দ্রও দেশাচার বা ধর্মশাস্ত্র দ্বারা সর্বদা চালিত হন নি, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে অধিকাংশ সময় একমত হতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসংক্রান্ত চিন্তাভাবনাকে অনেক সময়ই তাঁর মনে হয়েছে 'অন্ধকারপূর্ণ বঙ্গদর্শনী মত'। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র কোনোদিনই শ্রীকৃষ্ণের 'ব্রজলীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম' করতে পারেন নি, চৈতন্যলীলাও বোঝেন নি। ফলে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যেভাবে বঙ্কিম ও নবীনকে সমকালের ধর্মান্দোলনের পটভূমিতে একই বন্ধনীভুক্ত করেছেন, তা হয়তো তথ্যসমর্থিত নয়। Neo-Hinduism বা Hindu revivalism পরোক্ষভাবে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের প্রভাব এই

আন্দোলনের উপর কতটা পড়েছে বলা কঠিন। সে কালে বঙ্কিমচন্দ্রকে যেমন, নবীনচন্দ্রকেও তেমনই হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী সমাজপতিদের নিন্দা-সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী-কাব্যের সমালোচনা তথা দোষনির্দেশের জন্য বীরেশ্বর পাঁড়ে আড়াইশো পাতার একটি বইই লিখে ফেললেন—'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' (১৮৯৭)। বীরেশ্বর পাঁড়ে ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণির 'বেদব্যাস' পত্রিকার অন্যতম লেখক। গ্রন্থের 'উপসংহারে' তিনি লেখেন, "আমরা কেবল কবির নিন্দাই করিলাম দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারেন, কবির সহিত আমাদের কোনরূপ মনোবাদ আছে, তাই বিদ্বেষপরতন্ত্র হইয়া এ কাব্যত্রয়ের সমালোচনা করিতেছি। বাস্তবিক কবির প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ ভাব নাই। প্রত্যুত তাঁহার গৌরবে আমরা আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কবি অকারণ পূর্ব্বপুরুষগণের ও ঋষিগণের নিরতিশয় নিন্দা করিয়াছেন, --হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের বিলোপ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন,—আপনাকে হিন্দু নামে পরিচিত করিয়া তাঁহার কল্পিত কৃষ্ণ ও ব্যাসের দোহাই দিয়া অহিন্দু মত প্রচার করিতেছেন—যে মত প্রচারিত হইলে, হিন্দুর অস্তিত্ব থাকিবে না তাহাকে ব্যাসের ও কৃষ্ণের মত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" কৌতুকের বিষয় হলো, নবীনচন্দ্রকে আক্রমণ করার সময় সমালোচক আত্মপক্ষ সমর্থনে বারে-বারেই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বেঁচে নেই, তাই ধর্মধ্বজীরাও তাঁকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করছেন। তা না হলে নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ, বঙ্কিমচন্দ্রকেও একদা সে অভিযোগ শুনতে হয়েছে। আসলে কালের সাক্ষী হলে আপত্তি নেই, কালের শিক্ষক হতে চাইলেই বিপদ। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র দুজনেই সেই বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

বারোমাস, এপ্রিল ১৯৯৩।

নবীনচন্দ্র সেনের যাবতীয় রচনার জন্য দ্রষ্টব্য,

নবীনচন্দ্র রচনাবলী, সম্পাদক শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, দত্ত চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, চার খণ্ড, ১৩৮১-১৩৮৩।



উনিশ শতকের সাহিত্যবিবেক

রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' পত্রিকায় 'সাহিত্য-বিবেক' (১৮৫২) নামে প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারেই এক সাহিত্যাদর্শ উপস্থাপন করেন, যা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি সাহিত্যিকের সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড বলে গ্রহণ করা যায়। সাহিত্যবিবেক বলতে তখনও পর্যন্ত প্রাচ্য সাহিত্যাদর্শই বোঝাতো। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, মনে হয় তাঁদের সাহিত্যবিবেক গঠনে সহায়তার জন্য রাজেন্দ্রলাল প্রবন্ধটি লেখেন। তাঁর ভাষায় "উদ্দেশ্য-বাক্যে এক ব্যক্তি স্বীয় মনোগত অভিপ্রায় অপরকে ব্যক্ত করে। তদ্বাক্যের পরস্পর ঐক্য ও মাধুর্য্যাদি গুণ থাকিলে যে অভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করা যায় তৎসিদ্ধির সুলভতা হয়। সুতরাং তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন, এবং ঐ নিয়ম সাহিত্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে।" এখানে নিয়ম বলতে অলংকারশাস্ত্রের বাহ্য অনুশাসনের কথা বলা হয় নি (অবশ্য কাব্যবিচারে আলংকারিকেরা পদগত যে চোদ্দ রকম দোষের কথা বলেন তার উল্লেখ প্রবন্ধে পাওয়া যাবে),—জোর দেওয়া হয়েছে রসপরতন্ত্রতার উপর (তু. কবিনা প্রবন্ধম্ উপনিবধতা সর্বাত্মনা রস-পরতন্ত্রেণ ভবিতব্যম্)—"রসোদ্দীপন-বিষয়ে পরম্পরা পরীক্ষায় যে সকল নিয়ম উৎকৃষ্ট বোধ হইয়াছে তাহারই অনুশীলন করা আবশ্যক; বিশেষতঃ কাব্যাদি রচনা সময়ে, যখন অন্তঃকরণে যে সকল রস স্তব্ধীভূত থাকে তাহারই বর্ণনা করিতে হয়, তখন তদ্রসোদ্বোধ-বিষয়ক নিয়ম জানিবার অত্যন্ত প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইবে, আর এতজ্জন্য কেবল যে নিয়মেরই আবশ্যক এমত নহে; কিন্তু নিয়ম করিবার হেতু এবং ঐ রসের প্রকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করাও

কর্ত্তব্য ; নচেৎ উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা হইতে পারে না।" অবশ্য 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করলে রসোদ্দীপন সব সময় তার একমাত্র লক্ষণ নয়। রাজেন্দ্রলালকে তাই তিন ধরনের সাহিত্যের কথা বলতে হয়েছে—বুদ্ধ্যুদ্দীপক সাহিত্য, মনোব্যাবর্ত্তক সাহিত্য ও রসোদ্দীপক সাহিত্য।

রাজেন্দ্রলাল নিজে ছিলেন মনোব্যাবর্ত্তক সাহিত্য রচয়িতা, কিন্তু রসোদ্দীপক সাহিত্যের মর্মব্যাখ্যায় সুপারঙ্গম। আর সেখানে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের নির্দেশ কিছুটা অমান্য করে, সে কালের অভিনব বাংলা সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণে ও মূল্য বিচারে সক্ষম। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' সম্বন্ধে যখন তিনি মন্তব্য করেন "তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়। সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে।" তখন তাঁর সাহিত্যাদর্শ স্পষ্ট নয়, কিন্তু অনতিপরে তিনি দেখান মধুসূদনের "মন হইতে অন্যের যে কোন ভাব নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবৃত্তির কৌশলে নূতন অবয়ব ধারণ করিয়াছে; কিছুই প্রাচীন বলিয়া অনাদরণীয় বোধ হয় না; প্রত্যুত সকলি স্বচ্ছ, দীপ্তিময় ও প্রীতিকর অনুভূত হইয়াছে।" কল্পনা-প্রবৃত্তির কৌশল তিনি ব্যাখ্যা করেন নি, কিন্তু নব্যরীতির কাব্যবিচারে স্বতন্ত্র (অর্থাৎ প্রাচীন আলংকারিক বিচার-অনপেক্ষ) মানদণ্ডের কথা তাঁর মনে ছিল। (রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে শেলি ও কিট্সের প্রভাবের কথা তিনি বলেছেন)। 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলালের মন্তব্যও আমাদের মনে পড়বে, "যে সকল ব্যক্তি 'ওলো লো মালিনী'র রুনুঝুনু শব্দঝঙ্কারে মুগ্ধ হন ও অনুপ্রাসই কবিতার সার বলিয়া কৃতনিশ্চয় আছেন তাঁহাদের নিকট এই নূতন গ্রন্থখানি কোনমতে সমাদৃত হইবে না। পরন্তু যাঁহারা উৎকৃষ্ট প্রসঙ্গ, অলৌকিক কল্পনাশক্তি, চমৎকার লক্ষণা, প্রাঞ্জল রচনা ও প্রকৃষ্ট ওজোগুণ বিশিষ্ট বাক্যে মনের আনন্দ সাধন করিতে পারেন; যাঁহারা জ্ঞাত আছেন, যে

কবিতার মূলই সদ্ভাব, এবং তদভাবে সহস্র অনুপ্রাসও চিত্তের অনুমোদন করিতে পারে না, যাঁহারা রচনার অলঙ্কারকে অলঙ্কার বলিয়া জানেন, তাহাই প্রধান পদার্থ মনে করেন না, তাঁহাদিগের নিকট দত্তজার এই নূতন গ্রন্থ অবশ্যই উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইবে।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন 'সাহিত্যবিবেক' রচনা করেছেন, প্রায় সেই একই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখছেন 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩)। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, আবার সংস্কৃত সাহিত্যই তাঁর আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যবিচারে তিনি 'সহৃদয়তা'র উপর বেশি জোর দেবেন তা সহজেই বোঝা যায়। রাজেন্দ্রলালের মতো অলৌকিক কল্পনাশক্তির কথা তিনি বলেন না, কালিদাসের মধ্যে তিনি দেখেন 'অলৌকিক কবিত্বশক্তি'। কিন্তু লক্ষণীয় যে তিনি সে কালে আলংকারিকদের মতো সাহিত্যালোচনায় অত্যুক্তি বা অনুপ্রাসাদি অলংকারের ব্যবহার প্রশংসনীয় মনে করেন নি। মাঘ বা শ্রীহর্ষের কবিত্বশক্তি থাকলেও 'সহৃদয়তা' ছিল না, তাই অন্য গুণ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের রচনার কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেন। নিজের অজ্ঞাতসারেই রাজেন্দ্রলালের মতো তিনিও মনে হয় স্বতন্ত্র সাহিত্যাদর্শ দ্বারা চালিত হয়েছেন, তা না হলে এই ধরনের কথা তাঁর মুখে শোনা যেত না—"ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা যে ইহাকে [শিশুপালবধ] সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, ইহা কোন ক্রমে অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না।" "এতদ্দেশীয় লোকেরা, বিশেষতঃ নৈয়ায়িক মহাশয়েরা, এমন অত্যুক্তিপ্রিয় ও অনুপ্রাসভক্ত যে তাঁহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নৈষধচরিত সংস্কৃতভাষায় সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য।" অন্যদিকে বিদ্যাসাগরের মতে, "যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান অলঙ্কার, ঋতুসংহার আদ্যোপান্ত তাহাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি অলঙ্কার এতদ্দেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব

তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলেন না।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিবেক এতদ্দেশীয় লোক বিশেষত নৈয়ায়িকদের সাহিত্যাদর্শ থেকে পৃথক। 'কবিত্বশক্তি' বলতে কি বোঝায় তা অবশ্য বিদ্যাসাগর স্পষ্টভাবে কোথাও ব্যাখ্যা করেন নি, তবে আমরা দেখি কাব্যে তিনি একই সঙ্গে কবিত্ব ও রচনাশক্তির সন্ধান করেন। জয়দেব 'রচনাবিষয় যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য' দেখিয়েছেন, তাঁর 'কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী' নয়, তাই গীতগোবিন্দ 'অপূর্ব্ব মহাকাব্য' বলে পরিগণিত হয় না। রচনাশক্তি বলতে বিদ্যাসাগর বোঝেন—রচনা চমৎকারিণী ও মনোহারিণী, রচনা সরল মধুর কোমল ললিত ও প্রগাঢ়, রচনা অনাবশ্য বা পরিবর্তসহ শব্দ-বর্জিত। এ ব্যাপারে আলংকারিকদের সঙ্গে তাঁর মতের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু স্বভাবোক্তি অলংকারের জন্যই কাব্যের অবিসংবাদিত উৎকর্ষ—এই মত অনেকটা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদি বা প্রথম অলংকার বলেছেন সত্য—

নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী।
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতির্যথা॥

কিন্তু বিদ্যাসাগরের মতো রঘুবংশের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে এমন উক্তি সম্ভবত তিনি করতেন না—"অত্যুক্তির সংস্রব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্ত হৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না।" শুধু অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি নয়, 'অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান' সম্বন্ধেও বিদ্যাসাগরের আপত্তি ছিল। তাই কথাসরিৎসাগরের গল্পগুলি একসময় পাঠকের 'সাতিশয় মনোহর' মনে হলেও 'এক্ষণে আর তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব' নেই। এখানে যুগরুচির পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

তবে আধুনিককালে আমরা যাকে সাহিত্যতত্ত্ব বলি, উনিশ শতকে বাঙালি

লেখকেরা সে ধরনের গ্রন্থনিরপেক্ষ তত্ত্বালোচনায় তেমন আগ্রহ বোধ করেন নি। ফলে অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের আগে সাহিত্যসমালোচনার নিদর্শন মিললেও সাহিত্যতত্ত্ব রচনায় কেউ অগ্রসর হন নি। কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনা তো তত্ত্বনিরপেক্ষ নয়—"no criticism or history is possible without some set of questions, some system of concepts, some points of reference, some generalizations. There is here, of course, no unsurmountable dilemma: we always read with some preconceptions, and we always change and modify these preconceptions upon further experience of literary works. The process is dialectical: a mutual interpenetration of theory and practice." (Rene Wellek & Austin Warren, *Theory of Literature*). সাহিত্য-সমালোচনাকালে সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা তথা একটি সাহিত্যাদর্শ সমালোচকের মনে থাকে। ফলে বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্যসমালোচনা করেন তখন বিশেষ থেকে সহজেই তিনি নির্বিশেষে পৌঁছে যান—হয়তো অনেক সময় এমনই দ্রুত স্বতঃসিদ্ধ কিছু মন্তব্য করে বসেন যা পরে তাঁকে নিজেকেই খণ্ডন করতে হয় বা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় অন্য কোনো প্রবন্ধে। একে সাহিত্যতত্ত্ব বলতে কারও আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যনীতি হিসাবে এই সব মন্তব্য উনিশ শতকের সাহিত্যবিবেককে বুঝতে সহায়তা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছিল "যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লব্ধ হইয়া থাকে সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।" আর স্বভাবোক্তি সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের ধারণা আমরা আগেই জেনেছি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবোক্তির বদলে স্বভাবানুকরণের কথা বলেছেন,—"স্বভাবানুকারিতা না থাকায় আলেক লয়লা

পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থমধ্যে গণ্য নহে।" তবে শুধু স্বভাবানুকরণ সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে না, অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাব-সঙ্গত গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।" এখানে বেন্থামের মতের প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। বিদ্যাসাগরও অবশ্য সাহিত্যের মধ্যে শুধু আমোদ বা আনন্দের সন্ধান করেন নি, তিনি সাহিত্য থেকে উপকার ও উপদেশ লাভ করতেও চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের এই অংশ সবচেয়ে জটিল, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী উক্তিপরম্পরার সমাবেশ মনে হয়। 'নীতিশিক্ষা' কাব্যের 'মুখ্য উদ্দেশ্য' নয়। যাঁরা ভরতের মতো হিতবাদী (এখানে বিশেষভাবে নাট্যের কথা বলা হলেও সাহিত্য সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য)—ধর্ম্যং যশস্যমায়ুষ্যং হিতং বুদ্ধিবিবর্ধনম্।

লোকোপদেশ-জননং নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥

তাঁদের উদ্দেশ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন, "যদি তাহা সত্য হয়, তবে হিতোপদেশ রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না, বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতিবাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।" এই বক্তব্যের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই, তবে বঙ্কিমচন্দ্র এরপর যে কথা বললেন সে কথা তাঁর আগে বাংলা দেশে আর কেউ বলেন নি—

> কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রথমে কবির 'সৃষ্টিক্ষমতা'র কথা বলেছেন, পরে বলেছেন, "সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" আলংকারিকেরা হয়তো একথার প্রতিবাদ করতেন না (সৌন্দর্যম্ অলঙ্কারঃ। কাব্যং গ্রাহ্যম্ অলঙ্কারাৎ), কিন্তু 'রসোদ্ভাবনে'র প্রসঙ্গ আসা মাত্র অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধ ঘটে। অথচ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বর্ণিত 'রসোদ্ভাবন' ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা তিনি করেন নি। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত' ব্যাপারটিও স্পষ্ট হলো না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আরিস্টটলের সেই প্রাচীন সাহিত্যসূত্র অবলম্বনেই উনিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্যশাস্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকে রিয়ালিজম্-আইডিয়ালিজম প্রভৃতি শব্দগুলি যে সমস্যার সৃষ্টি করেছে তার মীমাংসা করা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে সাহিত্যাদর্শ হিসাবে তাঁর প্রদত্ত সূত্র সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে তিনি প্রয়োগ করতে পারেন নি—"সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিগুণ" ভবভূতির উত্তরচরিতে আছে কি না তা তাঁর আলোচনা থেকে বোঝা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের একদিকে মনে হয়েছে "সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।" অন্যদিকে তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—"যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি।" তাহলে কাব্যে আমরা কিসের সন্ধান করবো? বঙ্কিমচন্দ্র চাইছেন আদর্শ ও বাস্তবের সম্মিলন। কিন্তু কেমন করে সেই সম্মিলন ঘটে সে সম্বন্ধে মনে হয় একটা সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল। অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্রষ্টার কল্পনাশক্তির যোগ না ঘটলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম

সম্ভব নয়—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন। কিন্তু "সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল"—এ কথা সম্ভবত সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সে কথা জানতেন। দীনবন্ধু মিত্রের মতো লেখকেরা "সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। ...পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন।" কোনো সন্দেহ নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনায় সহানুভূতি কখনোই কল্পনাশক্তির ফল নয়, বরং সহানুভূতি কল্পনার অধীন। অন্যদিকে দীনবন্ধু মিত্রের নাট্যকৃতির পরিচয় দান কালে যে দু'ধরনের কবিপ্রতিভার কথা বলা হয়েছে তা কতদূর গ্রাহ্য বলা কঠিন, কারণ বঙ্কিমচন্দ্রই তো আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, "কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি।"

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য নিয়ে ভেবেছিলেন। কোনো সুসংবদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব রচনায় সক্ষম না হলেও তাঁর জিজ্ঞাসা তাঁকে নতুন এক পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছে। তবে পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির রহস্য অপেক্ষা সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বেশি তৎপর। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকেরা জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রেরণায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, ফলে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের একটি বিশেষ বক্তব্যকে সাহিত্যালোচনায়

তাঁরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন—"সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।" এর সঙ্গে 'দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন'-এর ইচ্ছাও কাজ করেছে।

দেখা যাবে 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকদের মধ্যে অধিকাংশজনই 'মঙ্গলসাধন'কে সাহিত্যসৃষ্টির পরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করেছেন। কিন্তু 'সৌন্দর্যসৃষ্টি'র কথাও তাঁরা ভুলতে পারেন নি।* পূর্ণচন্দ্র বসু প্রাচীনপন্থী সমালোচক হিসাবে পরিচিত, তবে

'বঙ্গদর্শনে'র লেখকদের মধ্যে তরুণ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য পরিণত বয়সেও সৌন্দর্যসৃষ্টিকে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা করেছেন। এদিক থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাহিত্যভাবনা নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন—

"বঙ্কিমবাবু সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন, এখন আবার লোকশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য সৃষ্টি লোকশিক্ষার দাসী হইল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর দাসী হইয়া গেল, বঙ্কিমবাবুও দাস হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, অথচ তাঁহার একটি ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।......যখন বঙ্কিমচন্দ্র সৌন্দর্যসৃষ্টিকে লোকশিক্ষার দাসী করিতে উদ্যত হইলেন, আমি তাহাতে রাজি হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম, চরম সৌন্দর্য্য, পরম সৌন্দর্য্য অথবা সৌন্দর্য্যের যাহাকে পরাকাষ্ঠা বলে, তাহাই চরম ধর্ম্ম, তাহাই পরম ধর্ম্ম। সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া দুই জিনিসই নষ্ট করা, দুটা জিনিসকেই পারমিতা প্রাপ্ত হইতে না দেওয়া বিশেষ দোষের কথা হইবে। আমি বলিয়াছিলাম, কালিদাস কোথাও ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মতো হিন্দুধর্ম্মের প্রচারকও বিরল। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আমাকে overrule করিলেন।" (নারায়ণ, আষাঢ় ১৩২৫)।

"মোটামুটি সাহিত্য সম্বন্ধে আমার শেষ একটি কথা বলবার আছে।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না। বিশ্বনাথের রসাত্মক বাক্যই কাব্য—এই সূত্রটি তাঁর জানা ছিল। পূর্ণচন্দ্র এ থেকে সিদ্ধান্ত করেন—"যাহার অধ্যয়নে হৃদয় বিগলিত হয়, হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহাই রসাত্মক বাক্য, তাহাই কাব্য। সুতরাং, যাহা রসাত্মক গ্রন্থ তাহারই অধ্যয়ন-ফল আছে, যাহার অধ্যয়ন-ফল কিছুই নাই, তাহা কাব্য নহে। যাহার অধ্যয়ন-ফলে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় মুগ্ধ হয়, তাহা নিকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহার রসে সমুদায় সমাজ মুগ্ধ, তাহা অতি উৎকৃষ্ট কাব্য, বিলাতী সেক্সপিয়ারের ভাল ভাল ট্র্যাজিডি-দ্বারা সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, তথাপি তাহারা কাব্য। তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট।" শেক্সপিয়রের নাটক নিয়ে সমালোচক বিব্রত, কারণ কাব্য হিসাবে উৎকৃষ্ট হলেও তার অধ্যয়ন-ফল অপকৃষ্ট। এই জন্যই পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সাহিত্যাদর্শ পরিত্যাজ্য। কিন্তু উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য বিদেশি ভাবপুষ্ট, ফলে পূর্ণচন্দ্রকে লিখতে হয় 'সাহিত্যে খুন'-এর মতো প্রবন্ধ। এ পর্যন্ত বোঝা যায়। যেটা বোঝা যায় না সেটা হলো তাঁর সৌন্দর্য-সন্ধান। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের পরোক্ষ প্রভাব কাজ করেছে—"যিনি স্বহৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভাবকতাদ্বারা বাহ্যজগতের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয়েন, যিনি স্বকীয় অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব-অনুভাবকতা শক্তি দ্বারা প্রকৃতির ঔদার্য্য, মহত্ত্ব এবং প্রকাণ্ডতায় চমৎকৃত হয়েন, স্বকীয় হৃদয়ের

> Highest art, highest morality, highest religion একই জিনিস। যেখানেই এর কোনো একটির নির্ম্মল ও সম্পূর্ণ বিকাশ, সেখানেই অপর দুটি আপনি এসে জুটে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে একটির ভিতর দিয়ে আর একটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা হয় তখনি সব পণ্ড হয়ে যায়। কালিদাস একথাটি খুব ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন ; তাইতে তাঁর রচনা এত নিখুঁত। তিনি 'কাব্য' লিখিতেন ; তার ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম প্রচার করতে চেষ্টা করেন নাই—ধর্ম্ম ও নীতি তাঁর লেখায় আপনি এসে জুটেছে।" (বাসন্তিকা, প্রথম খণ্ড, ১৩২৯)

ভাবপ্রাবল্য হেতু, মানবীয় এবং বাহ্যপ্রকৃতির প্রবলভাবসম্পন্ন দৃশ্যের সহিত যাঁহার সহানুভূতি জন্মে, তাঁহারা সকলেই উচ্চদরের স্বাভাবিক কবি।" (কাব্য-চিন্তা, ১৩০৭)। লক্ষণীয় যে, এখানে শুধু বাল্মীকি ব্যাস কালিদাস ভবভূতিকে নয়, হোমার শেক্সপিয়ার মিলটন এমনকি বায়রনকে পর্যন্ত 'উচ্চদরের কবি' বলেছেন সমালোচক।

বঙ্কিমযুগের অন্য দুই প্রবন্ধকার চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাহিত্য-ভাবনায় অনুরূপ দ্বিধা লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পুজোর মনোভাব উনিশ শতকের শেষ পাদে নানা কারণেই প্রবল হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের রচনায় এই ধরনের কথা মাঝে মাঝে শোনা গেলেও তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের উপর জাতিবৈরীভাব প্রভাব বিস্তার করে নি। কিন্তু চন্দ্রনাথ-অক্ষয়চন্দ্র ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত হয়েও পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে এক ধরনের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। যেখানে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে তাঁরা বিশদ আলোচনা করেছেন, যেমন অক্ষয়চন্দ্র ম্যাকবেথ ও হ্যামলেট নাটকের সমালোচনায়, সেখানে প্রতিপাদ্য হলো—"ইউরোপীয় দর্শনবিদ্যা অভিমানের, অহঙ্কারের, বাচালতার—চঞ্চলতার মায়াময়ী ধাত্রী। আমরা এই ধাত্রীর নিকট 'নাই' পাইয়া এখন এমনই বিগড়াইয়া উঠিয়াছি যে এখন স্বয়ং মাতা ক্রোড়ে করিতে চাহিলে তাঁহার কাছে যাইতে চাহি না, ধাইমায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে থাকি; মাকে গালি দিই, পা ছুঁড়িয়া মারিতে যাই। কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলি ডাইন। এই ডাইনের ক্রোড় হইতে আমাদিগকে ক্রমে সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু যেমন ডাইন তাহার তেমনই ওঝা চাই। ইউরোপীয় দর্শনের মায়ামোহ ইউরোপীয় কাব্য-নাটকের গভীর উপদেশে বোধ হয় কিছু কমিতে পারে। বোধ হয় পাঠক এতক্ষণে ধরিতে পারিয়াছেন যে সেক্সপিয়ারের নাটকের উপলক্ষ করিয়া আমরা বিলাতি ওঝার সাহায্যে বিলাতি ডাইনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টায় আছি। চেষ্টাটা যদি ভাল হয়, আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে কখন-না-কখন ভাল

ফল ফলিবেই।" অন্যদিকে অক্ষয়চন্দ্র কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বলেছেন "নাটক বল, নভেল বল, কাব্য বল, দর্শন বল, জগতে জড়, অজড় সকল পদার্থেরই বিকাশ বিশেষ নিয়ম-অনুসারে হইয়া থাকে। সকল পদার্থেরই আগম-নিগমের নিয়ম ও ক্রম আছে। সাহিত্যেরও সকল অবয়বের বিকাশের ক্রমনিয়ম আছে।" (নাটকের সৃষ্টিকাল)। আবার নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজেছেন বাংলা সাহিত্যে। আসলে চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যভাবনায় উনিশ শতকের বিলাতি সাহিত্য-তত্ত্বের প্রভাব আছে, কিন্তু তাঁদের কাছে "সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের চিরন্তন আদর্শ।" অথচ সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল না। ফলে তাঁদের সাহিত্যতত্ত্বে প্রকাশ পেয়েছে একদিকে রোমান্টিক সাহিত্যভাবনা (বায়রনের প্রতি পক্ষপাত), অন্যদিকে ক্লাসিক সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বসংস্কার ও মোহ (শেলি সম্বন্ধে প্রবল আপত্তিবোধ)।

কিন্তু এ যদি কেবল ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা ঝোঁক হতো তাহলে তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার ছিল না। আসলে সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রসঙ্গটি মূল্যবান, কারণ উনিশ শতকের শেষের দিকে দুটি স্বতন্ত্র সাহিত্যাদর্শ সাহিত্য-রচয়িতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। একদিকে প্রবীণ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতো অনেকেরই মনে হয়েছে—

> "কল্পনা কি ছায়াময়ী? আমি ত বলি, কল্পনা সুস্পষ্ট-অবয়বা, সুদৃষ্ট ভঙ্গিমতী এবং উজ্জ্বলবর্ণা। কল্পনার প্রিয় সহচরী কবিতাও ত ছায়াময়ী নহে, তবে তোমরা এরূপ কুয়াসার কুহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্য গোধুলি গোধুলি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন?
>
> "প্রকৃতিতে যে পরাকৃতির অংশ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়াই কল্পনার লীলা খেলা, তাহা লইয়াই কবিতার কুন্দন। পরাকৃতি ত অস্পষ্ট ছায়াময়ী নহে—সুস্পষ্ট কায়াময়ী। তবে সুস্পষ্টকে অস্পষ্ট করিবার জন্য তোমরা পাঁচজনে এত ব্যগ্র হইয়াছ কেন?" (কাব্যি-সমালোচনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৩)

অন্যদিকে তরুণ রবীন্দ্রনাথ যে শুধু নিজের কথা বলেছেন তা নয়—

> "কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ্য করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এই প্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া', কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাবিব্য' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।" (কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট, চৈত্র ১২৯৩)

এখানে শুধু কাব্যে স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতার কথা বলা হয় নি, 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (বৈশাখ ১২৮৮) নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই পুরনো তর্কই দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিশদভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্রের মতো অনেকের কাছে ফুল্লরার বারমাস্যা (আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান)—"সার্থক কবিত্ব ; সার্থক কল্পনা ; সার্থক প্রতিভা।" রবীন্দ্রনাথের তা মনে হয় নি, কারণ তিনি জানেন "যেমন জগৎ আছে, তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে, বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত ; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" এইভাবেই উনিশ শতকের সাহিত্যবিবেক পরিণতির পথে অগ্রসর হয়,— স্বভাবানুকারী ও স্বভাবাতিরিক্ত, ব্যক্তব্য ও অব্যক্তব্য, বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি, আমোদ ও উপদেশ নতুন তাৎপর্য লাভ করে। এদিক থেকে বিশ শতকের সাহিত্যবিবেকের পূর্বপ্রস্তুতি ও সূচনা ঘটেছে গত শতাব্দীতেই।